বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০২০ ▪ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

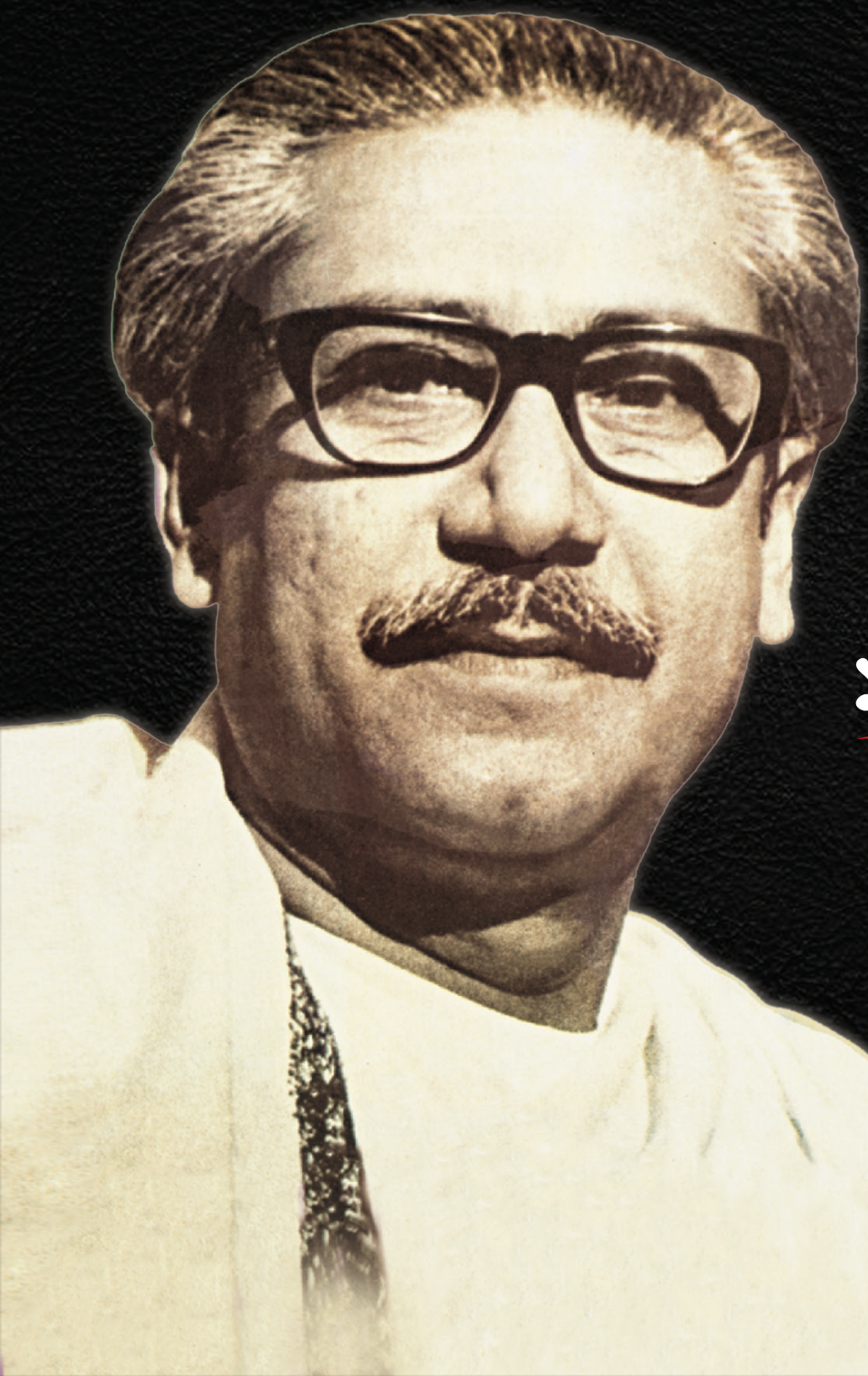

১৫ই আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস

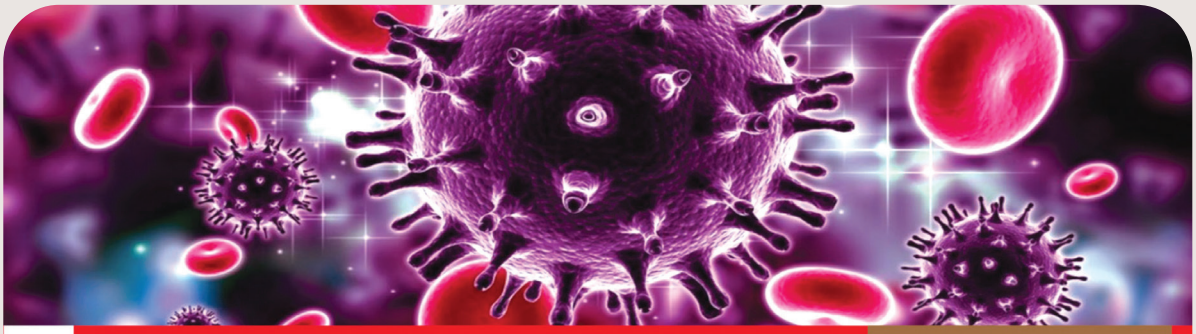

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট ২০২০ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭

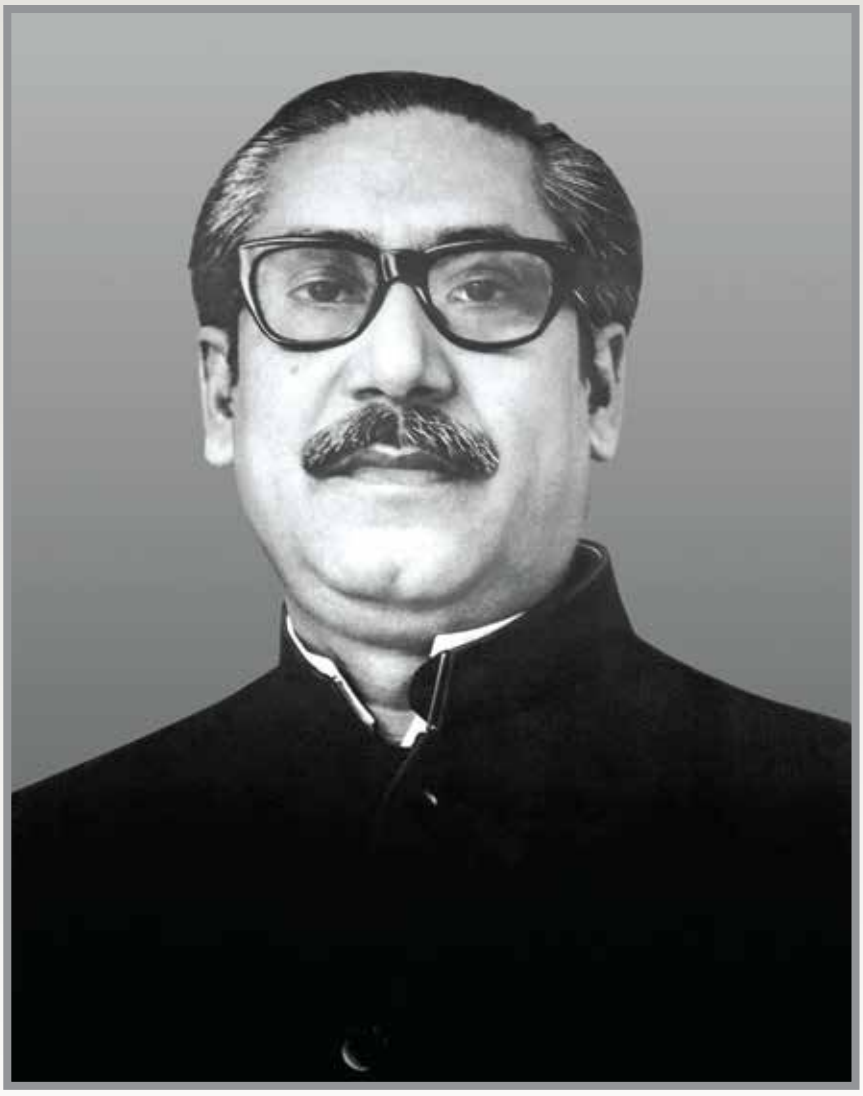

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহিদ হন। বাংলার মাটি ও মানুষের জন্য ভালোবাসায় যাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল, নরপিশাচদের নারকীয় তাণ্ডবে বুলেটের আঘাতে তা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পরাধীন যে জাতিকে এনে দিল স্বাধীনতা, সেই জাতিরই বিপথগামী কিছু সেনাসদস্যদের হাতে শহিদ হন বঙ্গবন্ধু। এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে! বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে *সচিত্র বাংলাদেশ* পরিবারের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা।

১৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই কবি বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ, এনে দিয়েছেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির গৌরব। চিত্রকর হিসেবে কবিগুরুর পরিচয় অনেকেরই অজানা। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রেমের কবি, বিদ্রোহের কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষেরা যুদ্ধ নয়, শান্তি চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে ১৯৪৫ সালেয় ৬ই আগস্ট সকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী জাপানের হিরোসিমা শহরের ওপর 'লিটল বয়' নামের নিউক্লিয় বোমা ফেলে। তিনদিন পর নাগাসাকি শহরের ওপর 'ফ্যাট ম্যান' নামের আরেকটি নিউক্লিয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বোমা বিস্ফোরণে হিরোসিমাতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মারা যায়। নাগাসাকিতে মারা যায় ৭৪ হাজার লোক। বোমার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় হাজার হাজার মানুষ। সেই বীভৎসতা আজও বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

এছাড়া গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ দিয়ে সাজানো হয়েছে আগস্ট ২০২০ *সচিত্র বাংলাদেশ* সংখ্যাটি। আশা করি, সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

তিনিই বাংলাদেশ ৪
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

মুজিববর্ষের আগস্ট মাস ৬
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার, বিচার, মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৯
প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

অনন্য অসাধারণ বঙ্গমাতা ১৫
মো. কামাল হোসেন

হিরোসিমা ও নাগাসাকি ধ্বংসযজ্ঞের ইতিকথা ১৭
রেহানা শাহনাজ

শোকের মাসে জন্মশতবর্ষে জাতির পিতা শেখ মুজিব স্মরণে ১৯
রহিম আব্দুর রহিম

ইসলামের দৃষ্টিতে কোরবানি ২১
মুহাম্মদ ইসমাঈল

যুক্তফ্রন্ট ও কোয়ালিশন সরকারে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩
মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

কোরবানি ঈদের অনন্য শিক্ষা ২৬
খান চমন-ই-এলাহি

চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ ২৮
সানিয়াত রহমান

বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক'
সফল পররাষ্ট্রনীতির স্বীকৃতি ৩০
কৃষিবিদ শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

জীবনমুখী উন্নয়ন ৩২
ফারিহা রেজা

কাজী নজরুল ইসলাম: মানবতা ও সাম্যবোধ ৩৪
শ্যামল কুমার সরকার

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ৩৭
মো. আবদুর রহমান

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগ ৩৯
মোতাহার হোসেন

মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধুর শাহাদত:
নেতৃত্ব, বীরত্ব ও আদর্শে অমর ৪১
কে সি বি তপু

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২০
মায়ের দুধ সন্তানের অধিকার ৪৩
হামিদা খাতুন

করোনায় ঈদ-উল-আজহা
সরকারের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা ৪৪
এস. শেফা শীলা

যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের সাফল্য ৪৬
মো. মাহমুদ হাসান

বাংলাদেশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশ্বে দ্বিতীয় ৪৮
সুস্মিতা চৌধুরী

হাইলাইটস

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল)
আইন ২০১৮: প্রয়োজন সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ৪৯
উষা রানী রায়
বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালতের সূচনা ৫১
জেসিকা হোসেন
ডিজিটাল কেনাকাটা ৫৪
মো. এনামুল হক
মশক নিধনে প্রয়োজন সমন্বয় ৫৫
আরীয়ান খান

গল্প
শহিদের উত্তরাধিকার ৫৯
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৫২, ৫৩, ৫৭, ৫৮
জায়েদুল আলম, মিলন সব্যসাচী, মোঃ বাবুল মিয়া দেলওয়ার বিন রশিদ, সৈয়দ শাহরিয়ার, মিয়াজান কবীর, নজমুল হেলাল, গোলাম নবী পান্না দেলোয়ার হোসেন, শাহনাজ, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর রুস্তম আলী, মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ, সুষমা ফাল্গুনী অমিত রেজা, নাজমা ইসলাম, শাহরিয়ার নূরী সৈয়দ পারভেজ, আপন চৌধুরী, ইফফাত রেজা, রাবেয়া নূর

বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৬৩
প্রধানমন্ত্রী ৬৩
তথ্যমন্ত্রী ৬৪
জাতীয় ঘটনা ৬৬
আন্তর্জাতিক ৬৭
উন্নয়ন ৬৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৮
শিল্প-বাণিজ্য ৬৯
শিক্ষা ৬৯
বিনিয়োগ ৭০
নারী ৭১
সামাজিক নিরাপত্তা ৭১
কৃষি ৭২
বিদ্যুৎ ৭২
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৩
নিরাপদ সড়ক ৭৪
কর্মসংস্থান ৭৪
স্বাস্থ্যকথা ৭৫
যোগাযোগ ৭৬
চলচ্চিত্র ৭৬
সংস্কৃতি ৭৭
মাদক প্রতিরোধ ৭৭
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৮
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৮
প্রতিবন্ধী ৭৯
ক্রীড়া ৭৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন কিংবদন্তি শিল্পী এন্ড্রু কিশোর ৮০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলার জনপ্রিয় সংগ্রামী নেতা ও স্বাধীনতার সিংহপুরুষ বঙ্গবন্ধু মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনে পরাধীন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য উপহার দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ। হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘপথ পরিক্রমায় তাঁকে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। তাঁকে অনেক বার জেলে যেতে হয়েছে। মৃত্যু ভয় দেখিয়েও তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি সপরিবার শহিদ হন। বঙ্গবন্ধু আদর্শে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। তাঁর আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'তিনিই বাংলাদেশ', 'মুজিববর্ষের আগস্ট মাস' ও 'বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার, বিচার, মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-**৪, ৬ ও ৯**

অনন্য অসাধারণ বঙ্গমাতা

২০১৭ সালের ৮ই আগস্ট থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে। ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ, সাহস, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি সহধর্মিণী হিসেবে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কাজের প্রেরণার উৎস। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জীবন দিতে হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকেও। তাঁকে নিয়ে 'অনন্য অসাধারণ বঙ্গমাতা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা- **১৫**

ঈদ-উল-আজহা

ঈদ-উল-আজহা মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব, যা কোরবানির ঈদ নামেও পরিচিত। কোরবানি হলো মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুসলিম জাহানের ওপর এক বিশেষ নিয়ামত যার আভিধানিক অর্থ- ত্যাগ করা, উৎসর্গ করা। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে খাস নিয়তে নির্দিষ্ট দিনে কোনো হালাল জন্তু জবেহ করার নাম কোরবানি। ঈদ নিয়ে 'ইসলামের দৃষ্টিতে কোরবানি' ও 'কোরবানি ঈদের অনন্য শিক্ষা' শীর্ষক দুটি নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা- **২১ ও ২৬**

জীবনমুখী উন্নয়ন

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় নাম। বাংলাদেশ ক্রমেই দারিদ্র্য জয় করছে। বাড়ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। বর্তমানে অর্থনীতির চলমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে। ফলে যোগাযোগ বেড়েছে। দেশের সম্পদকে সাধারণ জনগণের কল্যাণে সর্বাত্মক ব্যবহার করে লাগসই ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। যে-কোনো উন্নয়নমূলক পরিবর্তন অবশ্যই পরিবেশবান্ধব, লাগসই ও টেকসই হতে হবে। সাধারণ মানুষের পছন্দ মাফিক হবে এই পরিবর্তন। সব ধরনের নিজস্ব কৌশল সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে উন্নয়নে কাজে লাগাবে। এ বিষয়ে 'জীবনমুখী উন্নয়ন' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা- **৩২**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : **রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং**
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

তিনিই বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

এই আমি আজকে আমি হতে পারতাম না যদি বাংলাদেশ নামের স্বাধীন দেশটি না পেতাম। আজও হয়ত পরাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অজপাড়াগাঁয়ের কোনো এক স্কুলে বড়োজোর একজন শিক্ষক হিসেবে বেঁচেবর্তে থাকতাম। না হয় কোনো ছোটো অফিসের উচ্চমান সহকারী। আমার ধারণা, আমার মতো এমন আরো অনেকেই এই ধরনের আর্থসামাজিক অবস্থানে থেকে যেতেন। পাশাপাশি পরাধীন দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির একজন নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আদেশ-নির্দেশ পালন করে কোনোমতে বেঁচে থাকার ভান করতেন। কেউ কেউ হয়তবা তাদের খুশি করে সামাজিক মইয়ের দু-এক ধাপ উপরে উঠতেন।

কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ফসল বাংলাদেশ হতাশাজনক এই বাস্তবতাকে পুরোপুরি বদলে ফেলে। হতে পারে আমাদের অনেক ভাইবোনের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এখনো আসেনি। কিন্তু তাই বলে পরাধীন দেশের নাগরিকের মতো সারাক্ষণ বিদেশি প্রভুকে খুশি করে তাদের চলতে হয় না। অনেক সংগ্রাম করে হয়ত তাদের অনেককে বাঁচতে হয়। কিন্তু কারো কৃপায় তাদের বাঁচতে হয় না। স্বাধীনতার এই সুফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা যারা পরাধীনতার নাগপাশে ছিলেন না তারা ঠিক বুঝতে পারবেন না।

স্বাধীনতা আমাদের জন্য যে বহুমাত্রিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেসবের কারণেই বিশ্বজুড়ে পরিশ্রমী, উদ্যমী বাঙালির অবদান আজ স্বীকৃত। বিশেষ করে সারা বিশ্বের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালির শিক্ষা, গবেষণা, শিল্পোদ্যোগ, ব্যাবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত পদচারণা জাতি হিসেবে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করছে।

একথা ঠিক, স্বদেশের নানা স্থানে এখনো রয়েছে দুঃখ, বঞ্চনা, বৈষম্য, অবিচার। রয়েছে নানা মাত্রার অপূর্ণতা। আছে স্বাধীনতার শত্রুরা। তাই এখনো সমাজে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে প্রত্যাশিতভাবে কাটেনি আঁধার। তবুও আমরা গর্বিত আমাদের প্রিয় স্বদেশের জন্য। সুখে-দুঃখে যেভাবেই থাকি না কেন, প্রিয় বাংলাদেশকে আরো সজীব ও সুন্দর করার স্বপ্ন এবং সদিচ্ছার কোনো অভাব আমাদের বেশির ভাগ মানুষের মাঝে নেই। কিন্তু সে স্বপ্ন রূপায়ণে আমরা কতটা আন্তরিক এ প্রশ্ন যে-কেউই করতে পারেন।

তবু একটি প্রশ্ন বারবার মনে জাগে। সবার প্রিয় এই বাংলাদেশ কি এমনি এমনি অর্জন করেছি আমরা? যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামের হ্যামিলনের বংশীবাদকের জন্ম না হতো এদেশে, যদি তিনি এমন করে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বারবার মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়ার সাহস না দেখাতেন, যদি সারাটা জীবন শুধুই স্বদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য স্বদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়ে না বেড়াতেন, যদি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বারবার জেলে যাওয়ার মতো দেশপ্রেমের প্রমাণ না রাখতেন– তাহলে কি এত দ্রুত আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম? সর্বশেষ স্বদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির আশায় বড়ো ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনে যদি হাত না দিতেন, তাহলে কি তিনি পঁচাত্তরে এমন ট্র্যাজিক পরিণতির শিকার হতেন ?

এসব প্রশ্ন আমি তুলছি এ কারণে যে, তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁরই দেওয়া নাম বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আক্ষরিক অর্থেই তিনি এবং বাংলাদেশ সমার্থ। যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এমনি যাঁর অবদান, স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা কি তাঁর প্রাপ্য সম্মান রাষ্ট্রীয়ভাবে দিয়েছি। হীনমনা এই আমরাই কি দেয়াল থেকে তাঁর ছবিটি নামাইনি? 'বঙ্গবন্ধু সেতু' লেখা অক্ষরগুলো কি আমরাই উপড়ে ফেলিনি? এই 'শিক্ষিত' আমরাই কি কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যপুস্তক থেকে তাঁকে আড়াল করার পাঁয়তারা করিনি? একসময় তাঁর জন্মদিন ও শাহাদতবার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে নীরবে পার হয়ে যেত। অন্তত ওই দুদিনও কি মনে পড়ে না সুবিধাভোগী এলিটদের যে, তিনি ছাড়া বাংলাদেশ অস্তিত্বহীন। তারা কি জানেন না, তিনিই বাংলাদেশ। একথা ঠিক যে মৌল আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, তা থেকে আমরা এখনো বহুদূরে। তবুও যতটুকু সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করেছি তার ভিত্তিটা কি তিনিই তৈরি করে দেননি আমাদের?

তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে এতগুলো বছর পরও কেন আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ আসনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসম্মতভাবে বসাতে পারিনি? জাতির অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা কী করেছি?

একথাও ঠিক, এখন পাঠ্যপুস্তকে স্বমহিমায় উপস্থাপিত হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর সমাধিতে দেশচালকরা শ্রদ্ধা জানাতেও এখন যাচ্ছেন। তবুও এই আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এখনো আমরা তাঁকে আমাদের জাতীয় জীবনের পুরোপুরি অংশ করে তুলতে পারিনি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সন্তানরা তাঁকে গান্ধী, হো চি মিন, মাও সেতুং বা ম্যান্ডেলার মতো করে খুঁজে পাচ্ছে না। তেমন সুযোগ আমরা এখনও সৃষ্টি করতে পারিনি। উলটো একটা সময় ছিল, যখন তাঁর অবদানকে করা হয়েছে

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

কটাক্ষ। স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন– সে প্রশ্নে অযথাই তাঁকে করা হয়েছে বিতর্কিত।

আজ আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে, এই দুঃখজনক বিতর্কের কোনোই মানে নেই। ইচ্ছা করলেই ইতিহাসের সত্যকে জোর করে মনগড়া খাতে প্রবাহিত করা যায় না। করলেও তা টিকবে না। ইতিহাস তার আপন গতিতে নদীর মতো তার আপন পথ তৈরি করে নেবেই। ইতিহাস ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকবে। ইতিহাস কারো ক্রীতদাস নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন ইতিহাসের অন্তরাত্মা। বাংলাদেশের জন্মের প্রকৃত ইতিহাস এবং তার সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় অবদানের বিষয়টি ইচ্ছা করলেই কেউ বিকৃত করে পার পেয়ে যাবেন বলে মনে হয় না। হয়ত সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ানো যাবে। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ঠিকই সময়ের ব্যবধানে স্বমহিমায় থিতু হবেই, ঠিক যেমন এখন হতে শুরু করেছে। দেরিতে হলেও বিভ্রান্তির কালো মেঘ বিদীর্ণ করে সত্যের উজ্জ্বলতা ঠিকই ঠিকরে পড়তে শুরু করেছে।

এমনটিই যে হবে সে বিশ্বাস আমার মনে বরাবরই ছিল। আর সে কারণেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম অংশ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাস নির্মাণে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় অবদানের কথা বৈরী সময়েও বারবার বলেছি, লিখেছি। মহান মানুষটির কাছে আমাদের ঋণের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এই বাংলাদেশ সৃষ্টি না হলে, আগেই যেমনটি বলেছি, সময়ের স্রোতধারায় খড়কুটোর মতো আমরা অনেকেই ভেসে যেতাম। তাই বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে যাঁর দান সর্বোচ্চ, তাঁর জীবন ও জনগণের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ও কর্ম ঠিকমতো তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। ঋণশোধের এক ধরনের চেষ্টাও বলা চলে।

মাও সেতুং বলেছিলেন, কোনো মানুষের ৭০ শতাংশ ভালো গুণ থাকলেই তিনি ভালো মানুষ। ৩০ শতাংশ খারাপ বৈশিষ্ট্য সহজেই উপেক্ষা করা যায়। আমার বিচারে বঙ্গবন্ধুর ভালো বৈশিষ্ট্য এর চেয়ে ঢের বেশি। আপাদমস্তক ভালো মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান দুর্বলতা ছিল তিনি অতি গভীরভাবে মানবিক ও দয়ালু ছিলেন। সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মীদের বরাবরই তিনি বেশি ভালোবাসতেন। কখনো বিরোধী রাজনীতিকেরও ব্যক্তিগত অমঙ্গল চাইতেন না। দুঃসময়ে তারা জেলে গেলেও তাদের পরিবারের ভরণপোষণের ভার তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে দায়িত্ব নিয়েছেন। এসবের ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। আর সে কারণেই তিনি অনেক সময় তাদের ওপর কঠোর হতে পারেননি।

বাংলাদেশের শত্রুরা মরণকামড় বসিয়েছিল বাঙালির শ্রেষ্ঠতম সন্তানটির বুকে। শারীরিকভাবে তাঁকে নিঃশেষ করলেও তিনি যে রয়ে গেছেন আমাদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। দিনদিনই তিনি ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেকে। তিনি যে আমাদের অস্তিত্বের সমান। আমাদের জীবনেরই অংশ। তাই আমাদের সন্তানদের কাছে তাঁকে সঠিকভাবে তুলে ধরা সবারই এক নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে তাঁর জন্মদিন ও প্রয়াণদিনে তাঁকে স্মরণ করা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর জন্মদিন ও শাহাদতবার্ষিকী দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে। কেননা, এই রাষ্ট্রটিই যে আমরা পেতাম না, যদি না তিনি তাঁর জীবন বাজি রেখে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এমন করে সংগ্রামে লিপ্ত না হতেন। সেজন্যই যদি বলি, তিনিই বাংলাদেশ– তা ভুল হবে না।

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দিন দিন তিনি আমাদের মনোজগতে থিতু হচ্ছেন। প্রতিদিন তিনি আরো বড়ো হচ্ছেন। পুরো বাংলাদেশকেই যেন তিনি তাঁর দীঘল ছায়া দিয়ে ঢেকে দিতে চাইছেন। প্রতিদিন শান্তির সেই ছায়া দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেড়েই চলছে। সাধারণ মানুষের অতি কাছে থাকা বাঙালির প্রাণপ্রিয় বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের প্রধানতম নায়ক। শ্রেষ্ঠতম জাতীয় বীর।

১৫ই আগস্ট শোক দিবসে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। তাঁর গরিব-হিতৈষী ভাবনাগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করার দিন আজ। আসুন আমরা সে পথেই হাঁটি।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

মুজিববর্ষের আগস্ট মাস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বর্ষপঞ্জির ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত বাঙালির ইতিহাসের পাতা লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে থাকল। এই সময়টুকুর আমরা নাম দিয়েছি মুজিববর্ষ। মহামনীষী, ধর্মপ্রবর্তক ও রাজরাজাদের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বর্ষ, সন, অব্দ ও খ্রিষ্টাব্দ চালু রয়েছে সেই আদিকাল থেকে। আমরাও তাই ঐ সময়টুকুর নাম দিয়েছি শতবছরের আলোয় আবির্ভূত আমাদের প্রাণের মানুষ, বাঙালির স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অবতার মুজিবের নামে। মুজিব কে ছিলেন? মুজিব ছিলেন বাঙালি নামক জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। এই অর্থে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সাথে তুলনীয় ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের বাঁক বদলানো এক বিপ্লবী নেতা। উনিশ'শ বিশ সালের সতেরোই মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জন্মদিনের এ বছরটিকে আমরা শত বছরের আলোয় মুজিববর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

এই বছরটি পালনের ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছিল মার্চের আগে থেকেই। কিন্তু গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এর অপ্রতিরোধ্য প্রকোপ দেখা দিলে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে। মানুষকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নামতে হয়। জীবন-মরণ এই জটিল আবর্তে মানুষ এখনো চলমান। থেমে যায়নি আমাদের আয়োজনের কোনো কর্মধারা। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতির এই কালো ছোবল মানুষের পথচলা রোধ করতে পারবে না। থেমে যাবে না আমাদের প্রবহমান গতি। সকল বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় আমরা কাটিয়ে উঠবই।

এমনিতেই বছরের আগস্ট মাসটি সমগ্র বাঙালিসহ গোটা বিশ্বের বিবেকবান ও সভ্য মানুষের কাছে শোকাবহ ও বেদনার মাস। এ মাসের পনেরো তারিখে আমরা হারিয়েছি আমাদের পিতাকে, একটি জাতির ফাউন্ডার বা জন্মদাতাকে। হাজার বছরের মধ্যে এই ভূখণ্ডে তাঁর মতো কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেননি এবং বাঙালি কওমকে সকল অবরোধ থেকে মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দেননি। এ কারণেই ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'শেখ মুজিব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং এই জনপদের শ্রেষ্ঠ সন্তান'। সারাটি জীবন সংগ্রাম ও আন্দোলন করে সেই অবরোধ বিনাশ করেছেন। জীবনের প্রায় চৌদ্দটি বছর ক্ষমতাসীনদের জেল, জুলুম, নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু তাঁর শত্রুরা ওত পেতেছিল, তাঁর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, দেশি-বিদেশি শত্রুরাই তৎপর ছিল একাত্তর থেকে। কারণ একাত্তরেই তিনি হাজার বছরের বাঙালির স্বপ্নকে রূপদান করেছিলেন। যার শুরুটা ছিল তাঁর পিতৃভূমি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় কৈশোর জীবনে।

আমরা সবাই জানি এবং গোটা বিশ্ব জানে তাঁর জীবন সংগ্রামের ফসল পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন দেশ– বাংলাদেশ। সেই একাত্তরে তিনি পাকিস্তানিদের অধীনতা থেকে বাঙালিদের মুক্তি দিয়েছিলেন। দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়েছিলেন। আর পাকিস্তানি সৈন্যরা তো ঢাল-সুড়কি ফেলে আত্মসমর্পণ করেছিল আমাদের কম্বাইন্ড বাহিনীর কাছে। পাকিস্তানিরা সেই গ্লানি ভুলতে পারেনি। তাই বিভীষণ–মোশতাকদের লেলিয়ে দিয়েছিল আগস্টের কালো অন্ধকারে। তারা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, দুই কন্যা সন্তান ছাড়া পরিবারের সবাই, ভগ্নিপতির পরিবার, ভাগ্নে, ভাগ্নের স্ত্রী এবং হত্যাকাণ্ড ঘটনার সময় অদূরে মোহাম্মদপুরে ২/৩টি বাসায় ১৩ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। আগস্টের হত্যাকাণ্ডে অধিকাংশ নারী-শিশু প্রাণ হারায়। আগস্টের খুনি ফারুক-রশীদগং, মোশতাক ও পর্দার আড়ালে থাকা জিয়াদের গভীর ষড়যন্ত্র ও হত্যার কথা স্মরণ করে বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষ ও বিশ্বের বিবেকবান মানুষ চোখের অশ্রু ঝরায়। আগস্ট এলে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে শেখ রাসেল, সুকান্ত বাবু, বেবী, আরিফ, রিন্টু এবং মোহাম্মদপুরের বস্তি ঘরের নাসিমার কচি-কোমল মুখ। এরা সবাই শিশু-কিশোর ছিল। শুধু কি তাই, গত ৪৫ বছর আমাদের চোখে জল ঝরেছে বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ

পরিবারের সদস্যদের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

জামাল, শেখ নাসের, সুলতানা কামাল, পারভিন জামাল, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি, শামসুন্নাহার আরজু, কর্নেল জামিল, শহীদ সেরনিয়াবাত, পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান এবং খুনিদের গোলায় নিহত মোহাম্মদপুরের বস্তিঘরের রিজিয়া বেগম, রাশেদা বেগম, সাবেরা বেগম, আনোয়ারা বেগম, আনোয়ারা বেগম-২, সয়ফুল বিবি, হাবীবুর রহমান, আব্দুল্লাহ, রফিকুল, শাহাবুদ্দীন ও আমিনুদ্দীনের রক্তরঙা স্মৃতিও। কী দোষ ছিল এদের– 'শতাব্দী–শতাব্দী' এ প্রশ্ন উঁকি দেবে বাঙালির হৃদয়ে। আগস্ট বড়ো দুঃখ-বেদনার মাস। স্বজন হারানোর মাস।

আগস্টের খুনিরা শুধু বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও স্বজনদের হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশের সকল অবকাঠামো পরিবর্তন করে। প্রথমেই মোশতাক ও জিয়া খুনিদের মানুষ হত্যার দায় থেকে ফারুক-রশীদগংদের রেহাই দেয়। এরপর সংবিধান সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দেয়। বঙ্গবন্ধুকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি স্বাধীনতাকামী মানুষ তথা আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ওপর স্টিম রোলার চালায়। রক্তে ধোয়া বাংলাদেশটি হাফ-পাকিস্তানে পরিণত হয়। এভাবে চলে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। মোশতাক, জিয়া, সায়েম, সাত্তার, এরশাদ ও খালেদা জিয়া– একাত্তরের পরাজিত শত্রুদের বাইরে থেকে এনে দেশ শাসন করে। বাংলার ইতিহাসের সে এক ভয়ংকর ও দুঃসময়ের কাল। এই সময়েই তারা মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠক জাতীয় চারনেতা ও সেক্টর কমান্ডারদের হত্যা করে। একাশিতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা খুনি ও শাসকদের ভয়ডর উপেক্ষা করে প্রবাস থেকে স্বদেশে ফিরে এলে বাংলার আকাশে আবার নতুন সূর্য উদিত হয়।

আমরা ৩৪টি বছর আগস্টের খুনিদের বিচার দাবি করেছি। পিতা ও স্বজনের হত্যার বিচার দাবি করে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বাংলার ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছেন। অবশেষে তাদের ১৯৯৬ সালে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আদালতের সর্বশেষ রায় ঘোষিত হয়েছে ২০০৯ সালের ১৮ই নভেম্বর। রায়ে ধৃত ফারুক-বজলুল হুদাসহ ৫ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ২০১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি দিবাগত রাত ১২টার পরে অর্থাৎ ২৮ তারিখের প্রথম প্রহরে। এখনো ৫ জন ফাঁসির দণ্ডাদেশ পাওয়া খুনি পালিয়ে আছে। ইতোমধ্যে আরেকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার ন্যায়বিচারে সত্যের বিজয় হয়েছে। গোটা জাতি ও বিশ্বের বিবেকবান মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। মানুষ মারার দায় থেকে খুনিদের যারা নিষ্কৃতি দিয়েছিল, আজ তারা আস্তাকুঁড়ে। মোশতাক, জিয়ারা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে বাংলার রক্তে ধোয়া মাটি থেকে। আর শেখ মুজিব এখন বাংলার আকাশ ছাড়িয়ে পৃথিবীজোড়া। তবুও মুজিববর্ষের জন্মশত কর্মকাণ্ডের স্মৃতি-গাহনে আগস্টের হত্যাকাণ্ডের কথা আমাদের শোক ও বেদনার সাগরে স্মরণ করতে হয়।

২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত মুজিব শতবর্ষ পালনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হলেও মুজিববর্ষের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল মার্চের অনেক আগে। প্রথমে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। বছরব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে এবং জাতীয়ভাবে তা উদ্‌বোধন করা হয় বঙ্গবন্ধুর প্রিয় স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। আর এর আগে মুজিব জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে আমাদের প্রকাশনা জগতে নীরব বিপ্লব ঘটে যায়। তাঁরা ফেব্রুয়ারির বইমেলায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রকাশ করে শত শত বই। এসব বইয়ের তালিকা প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্থাপন করা হয় মুজিব জন্মশতবর্ষ পালনের দাপ্তরিক কার্যালয়। এ বছর মার্চে হানা দেয় করোনা ভাইরাস। গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশ কিছুটা হলেও স্থবির হয়ে আছে। কিন্তু জীবন থেমে থাকার নয়। এরমধ্যেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুজিববর্ষ পালনের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। আগামী ২৬শে মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষের কর্মসূচি পালনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। হয়ত আর কিছু দিনের মধ্যে আমরা করোনার অদৃশ্য আক্রমণ থেকে রেহাই পাব এবং পরবর্তী সময়ে পুরোদমে মুজিব জন্মশতবর্ষের ব্যাপক কর্মকাণ্ডগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব।

বঙ্গবন্ধুর নীতি ও নেতৃত্বের কারণে আজ বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অসাম্প্রদায়িক, বঞ্চনামুক্ত, গণতান্ত্রিক, ও মধ্যম আয়ের দেশই শুধু নয়, যুদ্ধাপরাধী নিপাত যাওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র। আর এর মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন–যা বাস্তবায়নে তাঁর প্রিয় কন্যা ও অনুসারীরা নিয়োজিত আছেন। নীতি ও আদর্শে বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব বার বার প্রমাণিত হয়েছে। তাইতো প্রখ্যাত চিন্তক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তাঁকে 'মধ্যরাতের সূর্যতাপস' বলেছেন। তিনি গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান, মোগল ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের মতো শাসক ছিলেন না। ছিলেন গ্রামবাংলার রাখাল সমাজ ও সাধারণ কওমের গতর খাটা মানুষের রাখালরাজা। তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, সি আর দাস, শেরেবাংলা, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর সংগ্রাম স্বপ্নের সরণিতে এক বৈপ্লবিক সত্তা। পুরনো ও ব্যর্থ নেতৃত্বকে তিনি অগ্রাহ্য করে একাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ধর্মীয় বিভেদকে তিনি পায়ে দলেছেন। উপমহাদেশের এই বিভেদ আজও বিদ্যমান, বঙ্গবন্ধু সেখানেও অসাম্প্রদায়িক স্ট্যাচু।

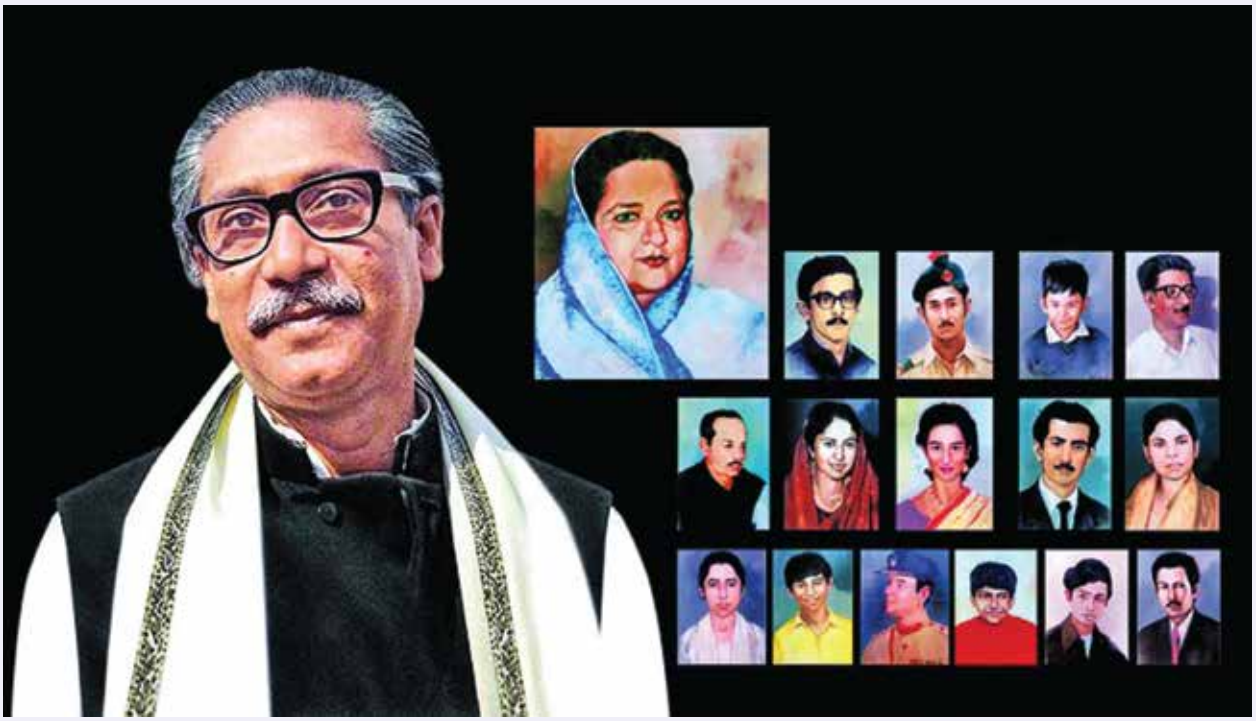

উল্লিখিত রাজনৈতিক নেতাদের বলয় থেকে তাঁকে পথ চলতে হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারার, অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলেন না। আন্দোলন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়েও তিনি হিংস হয়ে ওঠেননি, অহিংসই ছিলেন। তবে নির্যাতনকারী শোষকদের বিরুদ্ধে অসহযোগের কর্মসূচি দিয়েছেন। সশস্ত্র হতে নির্দেশ দিয়েছেন যা বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তি টেনে দেয়। তাঁর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ই বাংলাদেশ। তাই বাংলার আকাশে তিনিই একমাত্র নক্ষত্ররাজ। শত বছর কেন, যতদিন এই জনপদের মাটি ও আকাশ থাকবে, ততদিন শেখ মুজিবের অমর বাণী দুর্বলের পক্ষে শক্তি জোগাবে, শোষিতের পক্ষে গান শোনাবে। মুজিববর্ষের এটাই দৃঢ় প্রত্যয়।

আত্মজীবনী লেখার সময় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি যুদ্ধ করে এ পর্যন্ত হারিনি। ভবিষ্যতে হেরে যেতে পারি এমন আশঙ্কা যে করি না তা নয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশের মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে, আমার উপর আস্থা রাখে, দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিলে একাত্তরের মতো তারা আমার ডাকে সাড়া দিবে বলেই আশা করি। আর গরিব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বার্থে বড়ো লোকদের স্বাধীনতা ও যথেচ্ছ কথাবার্তা বলার অধিকার আমাকে কিছুদিনের জন্য কিছুটা ছাঁটকাট করতে হতে পারে। তাতে তারা গণতন্ত্র গেল গেল বলে চিৎকারও করতে পারে। কিন্তু একবার যদি শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে দেখবে আমার দলের চাটার দলও গরিবকে শোষণ এবং দুর্নীতি ও লুটপাটের অবাধ সুযোগ আর পাবে না। আমার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারলে আমি আবার দু'দল ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরে যাব'।

আমাদের মনে হয় বর্তমানে বাংলাদেশে সেই অবস্থা বিরাজ করছে। আর স্বমহিমায় আমাদের মাঝে শেখ মুজিবের অবস্থান এবং শত বছরের আলোক বিভায় তিনি আরো উজ্জ্বল। আগস্ট ও একাত্তরের ঘাতকরা আজ হারিয়ে গেছে। সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধির পথে এখন বাংলাদেশ। আগস্টের দুঃখ, শোক, বেদনা ও গ্লানি কিছুটা হলেও দূর করতে পেরেছি। কারণ আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে চলেছি। জয় বাংলা।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার ৯০তম জন্মদিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯০তম জন্মদিবস ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা তাঁর বেইলী রোডের সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ ঘোষণা করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, বর্তমানে করোনা মহামারি বিবেচনা করে বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মদিবস ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করা হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী। তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্তার অধিকারী, বিশ্বাসে অটল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী নারী। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কার্যক্রমে সকল চিন্তাধারার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন আর নেপথ্যে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন বঙ্গমাতা। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এ মহীয়সী নারী দেশের জন্য কাজ করে গেছেন এবং দলের কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন। বঙ্গমাতা শেখ ফতিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন সমাজের অনুরকণীয় আদর্শ। তাঁর কর্ম ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর ৮ই আগস্ট মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রতিবেদন: ফেরদৌসী বেগম

আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার, বিচার, মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

১৯৩৮ সালে স্কুলে পড়াকালীন বঙ্গবন্ধু প্রথম গ্রেপ্তার ও কারাবরণ করেন। এরপর পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ৭ মাসের মাথায় ১৯৪৮ সালের মার্চে ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে অনেক বার তিনি জেলে যান। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' মামলায় তাঁকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তান সামরিক জান্তা। জনগণের চাপে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বরং শেখ মুজিব আরো জনপ্রিয় হয়ে বঙ্গবন্ধু এবং এরপর জাতির পিতায় পরিণত হন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। বাঙালির জনমত এবং বহির্বিশ্বের চাপে জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে ফাঁসির রায় সত্ত্বেও মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেই পাকিস্তান সামরিক জান্তা তাঁকে ফাঁসি দিতে সাহস পায়নি অথচ তাঁর স্বজাতীয় কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের হাতে তাঁকে শহিদ হতে হয় পঁচাত্তরের আগস্টে।

পৃথিবীতে অনেক নেতা জন্ম নিয়েছেন যারা জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের বাস্তবায়নও করে দিয়েছেন। পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতি, একটি ভূখণ্ড, একটি নতুন পতাকার জন্মদাতা তিনি। তাইতো তিনি বাঙালির জাতির পিতা। এসব কিছু পাওয়ার পেছনে যেমন তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ছিল, তেমনি ছিল ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং দু লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগ। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে বাঙালির এই ত্রাণকর্তাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অনেক বার তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছে। অদম্য

সাহসী এই মানুষটিকে কখনো পাকিস্তানের স্বৈরশাসকরা আটকে রাখতে পারেনি, ভয় দেখিয়ে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। আগরতলা মামলায় ফাঁসির ষড়যন্ত্র কিংবা একাত্তরে প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আদেশ হলেও কেবল সাহস ও দেশপ্রেমের গুণে শেখ মুজিব বারবার ফিরে এসেছেন তাঁর জাতির কাছে, নিজ জন্মভূমিতে।

বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ ও বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য একাত্তরের শুরু থেকে পাকিস্তান সরকার নানান ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়। একদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা, অন্যদিকে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতায় প্রয়োজনে বাঙালি নিধন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা সমানতালে চলতে থাকে। পরিকল্পনা মোতাবেক পাকিস্তানি সেনারা বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে ২৫শে মার্চ রাত দেড়টা অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তার করে। তাঁর গ্রেপ্তারের খবর ও ঘটনা অবরুদ্ধ ঢাকার কোনো সংবাদপত্রে বের না হলেও বিদেশি গণমাধ্যম ও স্বাধীনতার পর সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত জানা যায়। *ওয়াশিংটন পোস্ট* ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ একটি প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর ঘর, বাগান তছনছ এবং বাইরে উড্ডীয়মান সবুজ, হলুদ ও লাল রং মিশ্রিত বাংলাদেশের পতাকা গুলি করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে–এ তথ্য পরিবেশন করে। গ্রেপ্তারের আগে পাকিস্তানি সেনারা কমান্ডো স্টাইলে গুলি করতে করতে বাড়িতে প্রবেশ করে, এমনকি একজন অফিসার বঙ্গবন্ধুকে গুলি করতে চাইলে অন্য একজনের হস্তক্ষেপে তিনি রক্ষা পান। যদিও গ্রেপ্তারের আগেই তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন। গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর তাঁকে পাকিস্তানের লায়ালপুর কারাগারে বন্দি রাখা হয়।

বিচার প্রক্রিয়া

একাত্তরের ২৬শে মার্চ প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্য আওয়ামী লীগ ও এর দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়ী করেন। তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পতাকা পুড়ানো ও পাকিস্তানের জাতির পিতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি ধ্বংস, সেনা বিদ্রোহ, বিহারি হত্যার অভিযোগ আনেন। শুরু থেকেই পাকিস্তান সরকার তাঁকে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রেডিও অস্ট্রেলিয়ার বরাত দিয়ে ভারতের *স্টেটসম্যান* পত্রিকা জানায়, ২৬শে মার্চ রাতেই ইয়াহিয়া খান ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'শেখকে মারতে হবে'। ১লা সেপ্টেম্বর তিনি ফরাসি *ল্য ফিগারো* পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের জনগণের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। সাংবাদিক ও লেখক রবার্ট পেইন তাঁর *ম্যাসাকার* গ্রন্থে ইয়াহিয়ার এমনি একটি ভাষ্য জুলাই মাসে লিপিবদ্ধ করেন এভাবে– 'সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করার জন্য আমার জেনারেলরা চাপ দিচ্ছেন। আমি সম্মত হয়েছি এবং খুব শিগ্‌গিরই বিচার অনুষ্ঠিত হবে'। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে ১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারি দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– রাষ্ট্রদ্রোহ, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচারণ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা। ১২টির মধ্যে ৬টি অভিযোগের প্রত্যেকটির জন্যই মৃত্যুদণ্ড হতে পারত। ৯ই আগস্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পাকিস্তান সরকার ১১ই আগস্ট বিচার শুরুর ঘোষণা দেয়। এও বলা হয় বিচার গোপন কক্ষে হবে এবং যাবতীয় তথ্য গোপন থাকবে। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। একজন বেসামরিক লোকের বিচার সামরিক আদালতে হতে পারে না –এই বলে সেদিন বঙ্গবন্ধু বিচার প্রহসনের প্রকাশ্য সমালোচনা করেন।

মূলত এটি ছিল কোর্ট মার্শাল। তাতে ৫ জন সামরিক অফিসার ও কয়েকজন বেসামরিক অফিসার ছিলেন। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছাড়াও রায়ের সর্বোচ্চ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছিলেন। বিচারের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনমনীয়। এ কারণে ইয়াহিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং মন্তব্য করেন, 'আচ্ছা শেখ তাহলে এখনো কথা বলতে চাচ্ছে না। ঠিক আছে, এই খেলা আমিও খেলতে জানি। বিচারকদের বলে দাও বিচার কাজ শেষ হয়েছে। আর বন্দিকে ফেরত পাঠাও মিয়ানওয়ালি জেলে। বিচার করা না করা কিছু আসে যায় না'। ইয়াহিয়ার এই উক্তি থেকে বন্দি মুজিবকে যে-কোনো মূল্যে হত্যার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। সেপ্টেম্বরে একজন সরকারি মুখপাত্র বিচার কাজ শেষে এ মাসেই রায় প্রকাশের ঘোষণা দেন। রায়ের আগেই পাকিস্তানের বিভিন্ন মহল থেকে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড নিয়ে পত্রপত্রিকাগুলো খবর প্রকাশ করে। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাফী আগস্টেই মন্তব্য করেন, 'তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে'। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও টিক্কা খান একাধিকবার একই মন্তব্য করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের বড়ো অংশ শিগ্‌গির তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ক্ষুদ্র একটি অংশ অন্তত বিচারের মাধ্যমে এ রায় কার্যকরের পক্ষে ছিলেন। ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীর এসব অফিসারদের দোহাই দিয়ে বার বার রায় দ্রুত কার্যকরের পথ খুঁজতে থাকেন।

বঙ্গবন্ধুর বিচার ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনো উপায় ছিল না। দেশের পত্রপত্রিকায় বিচারের ব্যাপারে তেমন খবর প্রকাশিত হয়নি। তবে মুজিবনগর সরকার এর প্রতিবাদ জানায়। অবরুদ্ধ দেশে ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

মুজিবনগর সরকার

বিচার শুরু হলে সারা পৃথিবীতে প্রতিবাদ দেখা যায়। মুজিবনগর সরকার শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি করে আসছিল। ১৯৭১ সালের ৫-৬ই জুলাই আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মুজিবনগর সরকার তাঁর মুক্তির জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায়। মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় ও আওয়ামী লীগ নেতারা বহুবার এ দাবি করেন। পাকিস্তান সরকারিভাবে বিচার কার্যক্রম শুরু করলে ১০ই আগস্ট মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ন্যায়, সততা, গণতন্ত্র ও মানবতার নামে বিশ্বের সকল দেশের সরকারপ্রধান ও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধ ও মুক্তির জন্য হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দেন।

১২ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ একই আবেদনের পাশাপাশি বলেন, 'শুধু বাংলাদেশের কল্যাণের স্বার্থে নয়, দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির জন্যও তাঁর বিচার বন্ধ করা উচিত'। এছাড়া বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠন সমাবেশ, বিক্ষোভ এবং আবেদনের মাধ্যমে বিচার বন্ধ ও মুক্তির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রচেষ্টা চালায়।

বহির্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশের পর বেশির ভাগ দেশ তাঁর মুক্তির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ সমস্যা' সমাধানে প্রাধান্য দেয়। তবে আগস্টে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে বিভিন্ন দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করে যা তাঁর মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ভারত

ভারত সরকার, বিরোধী দল, পার্লামেন্ট, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন সংগঠন শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি করে। ভারতীয় গণমাধ্যম এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। আগস্ট মাসে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরুর আগে থেকেই ভারত সরকার এ ব্যাপারে তৎপরতা দেখায়। ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে জুনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে 'বাংলাদেশ সমস্যা' সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানান। বিরোধী দল দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির মাধ্যমে মুজিবের বিচার ঠেকানো সম্ভব বলে মন্তব্য করে। কলকাতায় বিভিন্ন সাহিত্য, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরা এ সময় বঙ্গবন্ধুর মুক্তিকে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে উল্লেখ করেন। ৪ঠা ও ৯ই আগস্ট ভারতের লোকসভার বিতর্কে বঙ্গবন্ধুর জীবনরক্ষায় সরকারকে আরো উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানানো হয়। ৭ই আগস্ট একই দাবিতে সারা ভারতে পালিত হয় 'মুজিবমুক্তি দিবস'। ভারতের *স্টেটসম্যান* পত্রিকা ১১ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আগের দিন ১০ই আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের ২৪টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার বন্ধ ও তাঁর জীবনরক্ষায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারের আহ্বান জানান। এর পর পর রাজ্যসভা ও লোকসভার আলোচনায় অধিকাংশ বিরোধী দলীয় সদস্য বঙ্গবন্ধুর প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সরকারের আরো কঠোর ও দৃঢ় অবস্থান না নেওয়ায় সরকারের সমালোচনা করেন। এমনকি জনসংঘ (বিজেপি) আরো কঠোর ও দৃঢ় অবস্থান না নেওয়ায় সরকারের সমালোচনা করে। জবাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বিচার বন্ধে তাঁর সরকারের তৎপরতার কথা বিস্তারিত তুলে ধরেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসময় জাতিসংঘের মহাসচিবকে দেওয়া পত্রে মন্তব্য করেন, 'মুজিবের কিছু হলে এক মারাত্মক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি জন্ম দেবে'। সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশ সফরকালেও বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধ ও মুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে প্রভাব বিস্তারের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি তৎপরতায় শুধু মুক্তির ইস্যুই নয়, 'বাংলাদেশ সমস্যা'র রাজনৈতিক সমাধান, শরণার্থীদের দেশে ফেরার ব্যাপারটিও গুরুত্ব পায়।

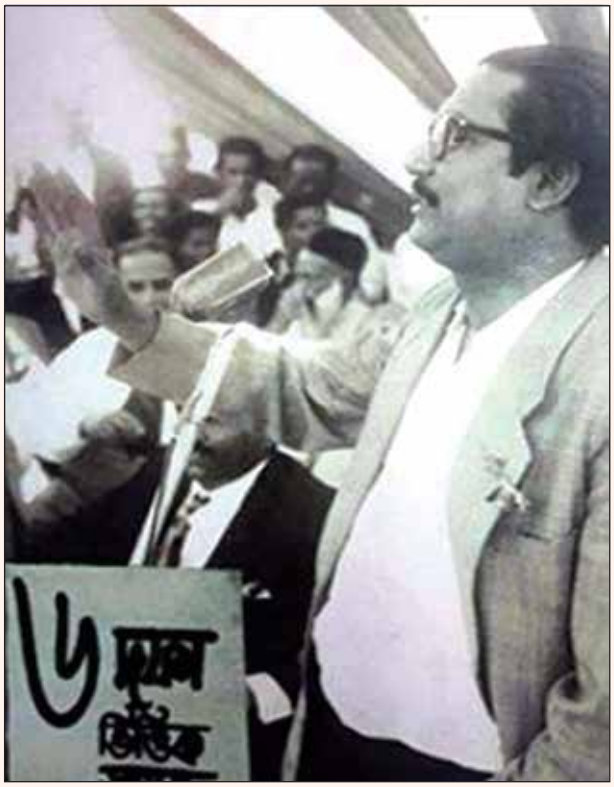

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রচারণায়

পশ্চিমা বিশ্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন দিলেও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে পার্লামেন্ট সদস্য, সুশীল সমাজের চাপে সরকার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে মার্কিন গণমাধ্যমও সোচ্চার ছিল। আগস্টে পাকিস্তান সরকারের বিচার ঘোষণার সময় সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি ভারত সফর করছিলেন। তিনি ভারতের বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে তাঁর মুক্তির জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। একই সময় (১২ই আগস্ট ১৯৭১) শিলং সফররত সিনেটর চার্লস পার্সি বলেন, 'মুজিবের প্রাণদণ্ড হলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ'। তিনি তাঁর সরকারের পাকিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তারের আশ্বাস দেন। একই দিন ভারতে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং বলেন, 'শেখ মুজিবের বিচার বন্ধে সরকার তৎপর রয়েছে'। মার্কিন পত্রিকা *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর* এক সম্পাদকীয়তে একই দিন বিচারকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের সংবাদ প্রচার করে। অন্যদিকে ওয়াশিংটনের *দ্য ইভেনিং স্টার* পত্রিকা ইসলামাবাদকে আর্থিক সহায়তার সমালোচনা করে বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানে প্রভাব খাটাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে পত্রিকাটি 'একটি অনিবার্য ট্র্যাজেডির প্রতিষেধক' বলে অভিহিত করে। আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা সিসকো ওয়াশিংটনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করেন যে, মুজিবের গোপন বিচার শুধু পাকিস্তানের বিদ্যমান পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানে বাধা হবে না বরং আমেরিকায় প্রবল

প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। বঙ্গবন্ধুর বিচারের ঘোষণা দেওয়ার পরে মার্কিন সরকার দ্বিতীয়বারের মতো উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে যে, 'শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রয়াস, পূর্ব বঙ্গের সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের সকল সম্ভাবনা নষ্ট করবে'। এছাড়া তাঁর মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ৫৮ জন কংগ্রেস সদস্য ও ১১ জন সিনেটরের স্বাক্ষরসহ চিঠি পররাষ্ট্র সচিব রজার্স পাকিস্তানের রাষ্টদূত আগা হিলালির কাছে হস্তান্তর করেন। বহির্বিশ্ব ও মার্কিন হস্তক্ষেপের কারণে শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরের পর বিচার প্রক্রিয়া থেমে যায়।

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্য সরকার, গণমাধ্যম, পার্লামেন্ট শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পক্ষে কাজ করে যায়। ব্রিটিশ সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খানকে সরাসরি, কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে লন্ডনে পাকিস্তান হাইকমিশনার সালমান আলীকে কমনওয়েলথ মহাসচিব বিচারের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউম এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে বিদেশে ভারতের পর সবচেয়ে বেশি সভাসমাবেশ, প্রতিবাদ ওঠে যুক্তরাজ্যে। লন্ডন এগুলোর প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব সমাবেশে বহু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য, বুদ্ধিজীবী অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রতি সমর্থন জানান। ৮ই আগস্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে লন্ডনে এমনি একটি সভায় পার্লামেন্ট সদস্য জে. স্ট্যালার্ড বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেন। আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু নিযুক্ত বিদেশি আইনজীবী টমাস উইলিয়াম *লন্ডন টাইমস*-এর এক প্রবন্ধে এ বিচারকে 'প্রহসন' বলে অভিহিত করেন এবং ১৯৬৯ সালে ঐ মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের অসারতার কথাও তুলে ধরেন। সেপ্টেম্বর মাসে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি বৈঠকে প্রায় সকল সদস্য এই বিচারের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। কমনওয়েলথ-এর প্রাক্তন সেক্রেটারি আর্থার বটমলি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে পাকিস্তানকে চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুকে বিদেশি আইনজীবী গ্রহণের সুযোগদানের অনুরোধ জানিয়ে ব্রিটিশ আইন সহায়তা প্রতিষ্ঠান বানার্ড শেরিডান অ্যান্ড কোম্পানি পাকিস্তান সরকারকে চিঠি দিলে সরকার কোনো জবাব দেয়নি। কোম্পানির ১০ই আগস্ট দেওয়া চিঠিটি লন্ডনের *দি টাইমস* পত্রিকা প্রকাশ করে এবং গোপন বিচারের বদলে তাঁর প্রকাশ্য আদালতে বিচারের পরামর্শ দেয়। *সানডে টাইমস*-এর প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া বলেন, 'দেশের আইন অনুসারে তাঁর বিচার করা হবে। তার মানে এই নয় যে আগামীকালই আমি তাঁকে গুলি করব'। তবে সেদিনের পর বঙ্গবন্ধুর জীবনে কী হবে সে ওয়াদা তিনি করেননি। বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের তৎপরতায় ব্রিটিশ সরকারও সচেষ্ট হয় এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে এবং সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধে প্রভাব বিস্তার করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

সোভিয়েত সরকার, শান্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে গণহত্যা বন্ধ, রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দেয়। বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হলে এর বিরোধিতা করে। আগস্ট মাসে ভারত সফরকালে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীও অনুরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেন।

অন্যান্য দেশ

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পত্রের পর বিভিন্ন দেশ বিষয়টি গুরুত্ব দেয়। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ১৩ই আগস্ট পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পত্রে পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ক্ষমতাশালী এই নেতার বিচার বন্ধে শুধু আহ্বান করেনি, এর ফলে পাকিস্তানে সংঘাতের পথ সুগম হবে বলেও মন্তব্য করে। অস্ট্রেলিয়ার চ্যান্সেলর ব্রুনো ক্রীস্কি এক বিবৃতিতে সামরিক জান্তা কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইউরোপের কোনো গণতান্ত্রিক দল এ অন্যায় সহ্য করত না। এভাবে অনেক ইউরোপীয় দেশ এর প্রতিবাদ জানায়।

জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

বঙ্গবন্ধুর বিচারের ঘোষণা প্রকাশের পরপরই বিভিন্ন দেশ জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়। মহাসচিব উথান্ট এতদিন এ ব্যাপারে মৌন থাকলেও ১০ই আগস্ট পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগা শাহীকে শেখ মুজিবের বিচার বহির্বিশ্বে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে জানান। তিনি আরো বলেন, এই বিচার মানবিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু মহলের আগ্রহ ও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মহাসচিব এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁর উদ্বেগের বিষয় জানান। এছাড়া জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন ১৭ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল ম্যাক ডারমোট ইয়াহিয়া খানকে দেওয়া পত্রে 'দণ্ডাদেশ পরিবর্তনের মতো বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত পুনরায় সহিংসতা বা বিপ্লবের তীব্রতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং প্রশমনে সাহায্য করবে' বলে মতামত দেন'। আন্তর্জাতিক শান্তি পরিষদ গোপন বিচার বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানায়। এছাড়া গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশন, মার্কিন আন্তর্জাতিক কাউন্সিলসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা একই দাবি করে।

বিচারের সর্বশেষ পরিস্থিতি

সামরিক জান্তা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গোপন বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার যে পরিকল্পনা করেছিল সেটি পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ায় এবং বিশ্ব সম্প্রদায় এ বিচারের পক্ষে না থাকায় এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। ইয়াহিয়া উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিচারের রায় প্রকাশ গোপন রাখেন। ৩রা ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হলে নিশ্চিত পরাজয় জেনে ৪ঠা ডিসেম্বর তড়িঘড়ি করে বিচারের রায় ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সেলে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য অনুযায়ী সেলের পাশেই তাঁর কবর খোঁড়া হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ টেলিগ্রাম পাঠানোর কথা থাকলেও ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের কারণে আর টেলিগ্রাম পাঠানো হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয়ের আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করলেও ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ এবং প্রাণপ্রিয় নেতার অনুপস্থিতি তাদের বিষণ্ন করে তোলে। বঙ্গবন্ধু জীবিত

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২–ডিএফপি (ফাইল ফটো)

কি-না, তাঁর অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন লেখালেখি চলতে থাকে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দ ২৩শে ডিসেম্বর দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আরো বেশি সোচ্চার হন। বাংলাদেশে তাঁর মুক্তির জন্য জোরালো দাবি ওঠে। এমনি পরিস্থিতিতে ২০শে ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের নিকট বঙ্গবন্ধুর অবস্থান পরিষ্কার করেন। বিশ্বের সকল গণমাধ্যম উৎসুক ছিল প্রিয় নেতার মুক্তির জন্য। *নিউইয়র্ক টাইমস* ২১শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের ঘোষণা প্রথম প্রকাশ করে এবং পরের দিন একই পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। অবশ্য ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনার জন্য ২৩ তারিখে তাঁকে পিণ্ডি আনা হয় । ভুট্টোর হাতে তুলে দেওয়ার সময় ইয়াহিয়া ভুট্টোকে পেছনের তারিখ দিয়ে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও ঝানু রাজনীতিবিদ ভুট্টো ফাঁসির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুকে চাপ প্রয়োগ করে 'পাকিস্তানের দুঅংশের' মধ্যে ঐক্যের সর্বশেষ চেষ্টা চালান। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভুট্টোর ২৭শে ও ২৯শে ডিসেম্বর দু'টি বৈঠকের কথা জানা যায়। মার্কিন, ব্রিটিশ ও জাপানি পত্রিকায় এ আলোচনা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এ আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকাগুলোতে না পাওয়া গেলেও বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার, ভুট্টোর জীবনীকার স্টেনলি উলপার্ট ও সাংবাদিক রবার্ট পেইনের লেখায় অনেক তথ্য জানা যায়। দুই বৈঠকেই ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু কৌশলে দেশে ফিরে জনগণের সঙ্গে কথা না বলে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে ভুট্টো পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে 'অন্তত কনফেডারেশন'র প্রস্তাব দেন। একইসঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের প্রস্তাবও দেন। উলপার্ট নিজেও স্বীকার করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে ব্ল্যাকমেইল করার কাজে এই বৈঠকের আলোচ্যসূচিকে ব্যবহার করেছেন। বৈঠকের পর এবং শেখ মুজিবের পাকিস্তানে অবস্থানকালেই ১লা জানুয়ারি ১৯৭২ *ভয়েস অব আমেরিকাকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো দু'অংশের ঐক্য এবং একটি রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরের দিনই করাচিতে দেশের নীতি নির্ধারকদের বৈঠকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও ঐদিন মার্কিন সাময়িকী *টাইমস* ভুট্টো'র বক্তব্যের বরাত দিয়ে জানায়, এ সিদ্ধান্তের পেছনে 'পাকিস্তানের উভয় অংশের' নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমঝোতা কাজ করেছে। অবশ্য রবার্ট পেইন পরিষ্কার মন্তব্য করেন, শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে কোনো চুক্তি বা এ জাতীয় কোনো সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ভুট্টো মুজিবকে

মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে মুক্তির ঘোষণা দিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেননি। পত্রিকা মতে তখনো ভুট্টো সমঝোতার আশা ছাড়েননি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে থাকার সময়ও গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৬ই জানুয়ারি ভুট্টো 'দুই পাকিস্তানের' ঐক্যের স্বার্থে খুব শিগ্‌গির ঢাকা সফরের একতরফা ঘোষণা দেন। শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, এমনকি পাকিস্তানের কয়েকজন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের চাপের কথা ভুট্টো নিজেও গণমাধ্যমে স্বীকার করেন। এসময় ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা প্রদানকারী দেশ তুরস্ক অথবা ইরানে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ভুট্টোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে ৮ই জানুয়ারি আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বীরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ তুলে ধরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান, দেশ পুনর্গঠনে সহায়তা কামনা, সর্বোপরি জাতিসংঘের সদস্যভুক্তিতে সমর্থনের আহ্বান জানান। ১০ তারিখে দিল্লিতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতিকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিসহ উচ্চপদস্থদের সঙ্গে বৈঠক এবং জনসভায় ভাষণে একই আহ্বান জানান। উভয় দেশের সরকার শপথ গ্রহণের আগেই তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করে। দিল্লিতে ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়। স্বভাবসিদ্ধভাবে বঙ্গবন্ধু প্রত্যেকটি বক্তৃতা শেষ করেন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে।

১০ই জানুয়ারি দুপুর ১.৪৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ব্রিটিশ কমেট বিমানটি ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করলে অভূতপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। তিনি বিমানবন্দর থেকে ৫ কিলোমিটার পথ জনারণ্য ঠেলে মটর শোভাযাত্রাসহ ২ ঘণ্টা পর রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে উপস্থিত হন। দীর্ঘ ১০ মাস পর বাঙালি জাতি তার পিতা, শ্রেষ্ঠ সন্তানকে ফিরে পায়।

সেদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের আত্মত্যাগ, বীরাঙ্গনাদের অবদান স্বীকার করেন এবং পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের নৃশংসতা তুলে ধরেন। যেসব দেশ বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। মুক্তিযুদ্ধ শেষে এবার দেশবাসীকে দেশ পুনর্গঠনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আহ্বান জানান। বিগত ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠকের সূত্র ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে ঐক্য ও কনফেডারেশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরিষ্কার ঘোষণা করেন, 'এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে'। বঙ্গবন্ধু সেদিনকার সংক্ষিপ্ত অথচ নীতি নির্ধারণী বক্তৃতায় রাষ্ট্রের মূলনীতি, পররাষ্ট্রনীতির দিক নির্দেশনা, সকল দেশের স্বীকৃতি ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভে সকল দেশের সহযোগিতার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ হলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তাঁর নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার কাজে এগিয়ে গেল।

দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ, বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু নতুন লাল-সবুজের পতাকা বাঙালিকে উপহার দেন। একমাত্র সাহস ও মনোবল তাঁকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে। ফাঁসির হুকুমেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। বাংলা, বাঙালিকে ভুলে যাননি। রেসকোর্স ময়দানে ১০ই জানুয়ারির বক্তৃতায় তাই অকপটে বলে গেলেন, 'আমি ঠিক করেছিলাম, আমিও তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা'। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি তা-ই প্রমাণ করে গেলেন। যেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে ফাঁসি দিতে সাহস পায়নি, তাঁর স্বজাতীয় বিশ্বাসঘাতকরা সেই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি, বীরের মৃত্যু নেই, বীর মৃত্যুঞ্জয়ী। বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শে বেঁচে আছেন, চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

লেখক : ডিন, কলা অনুষদ; অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ও পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সায়মা ওয়াজেদ হোসেন সিভিএফের দূত মনোনীত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) বিষয় ভিত্তিক দূত হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। ২২শে জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ হোসেনসহ চারজন সিভিএফ-এর দূত মনোনীত হয়েছেন। অন্যরা হলেন– মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট নাশিদ কামাল, ফিলিপাইনের ডেপুটি স্পিকার লরেন লেগ্রেডা ও কঙ্গোর জলবায়ু বিশেষজ্ঞ তোসি মাপ্পু। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এই চার দূতকে সিভিএফ-এ ভূমিকা রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সিভিএফ-এর পক্ষে এই চার দূত জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বিকাশে প্রচারণা চালাবেন। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত। অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে তিনি বিশ্বব্যাপী কাজ করছেন। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব দেশ প্রবল ঝুঁকির মুখে রয়েছে, সেসব দেশের জোট সিভিএফ। বিশ্বের ৪৮টি দেশ সিভিএফ-এর সদস্য। বাংলাদেশ চলতি বছর থেকে সিভিএফ-এর চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

প্রতিবেদন: জয় হোসেন

অনন্য অসাধারণ বঙ্গমাতা

মো. কামাল হোসেন

জাতীয় জীবনে আগস্ট এক বেদনাবিধুর মাস। শোকে কাতর বাঙালি জাতির জাতীয় শোক দিবস এ মাসের পনেরোই আগস্ট। ১৯৭৫ সালের এ মাসেই বাঙালি জাতি হারিয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বেদনার এ মাসে বঙ্গবন্ধুপত্নীর জন্মদিন ৮ই আগস্ট। শোকের মাসেও তাই এদেশের মানুষ চোখের শোকাশ্রু মুছে এক মহীয়সী নারীর ত্যাগ ও দুঃখবরণ এবং দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়।

২০১৭ সালের ৮ই আগস্ট থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন জাতীয়ভাবে পালনের সুপারিশ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদনের পর বঙ্গমাতার জন্মদিন জাতীয়ভাবে পালন হয়ে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মদিবস ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তাঁর বাবার নাম শেখ জহুরুল হক এবং মায়ের নাম হোসনে আরা বেগম। এক ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোটো। শৈশবে বাবা-মাকে হারানোর পর শেখ ফজিলাতুন নেছা বেড়ে ওঠেন দাদা শেখ কাশেমের কাছে। সম্পর্কে তিনি জাতির পিতার আত্মীয় হতেন। খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার। শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবর-ননদের সঙ্গেই তিনি বেড়ে ওঠেন।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠার পেছনে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অসাধারণ ভূমিকা ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে পর্দার অন্তরালে থেকে তিনি পরামর্শ, সাহস, অনুপ্রেরণা ও সকল কাজে সহযোগিতা দিয়েছেন। বঙ্গমাতার অবদান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখত। যাতে আমার কষ্ট না হয়'। (সূত্র: শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা নং ১২৬)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটের নেপথ্যে থেকে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা জুগিয়েছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী হয়ে তাঁর প্রতিটি কাজে প্রেরণার উৎস হয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জাতির পিতার সঙ্গে বুলেটের নির্মম আঘাতে জীবন দিতে হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে।

বঙ্গবন্ধু বেগম মুজিবকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। দেশের জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে পরিবারের জন্য, বিশেষ করে নিজের স্ত্রীকে যথেষ্ট সময় তিনি দিতে পারেননি। স্ত্রীর প্রতি জাতির পিতার ভালোবাসার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর লেখায়। তিনি লিখেছেন, 'রেণু তো নিশ্চয় পথ চেয়ে বসে আছে। সে তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলে না বা বলতে চায় না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে'। (সূত্র: শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা নং ১৪৬)

বঙ্গবন্ধুর প্রতি বেগম মুজিবের গভীর ভালোবাসার কথাও উঠে এসেছে *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* পাতায়। বিদায় দেওয়ার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'রেণু আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। আমি ওকে

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব–ফাইল ছবি

বোঝাতে চেষ্টা করলাম না, একটা চুমো দিয়ে বিদায় নিলাম। বলবারতো কিছুই আমার ছিলো না, সবই তো ওকে বলেছি'। (সূত্র: শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা নং ১৬৪)

বঙ্গবন্ধু বারবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। কিন্তু ভেঙে পড়েননি বেগম মুজিব। তিনি সবসময় জাতির পিতাকে সাহস জুগিয়েছেন। পরিবারের সদস্য ও দলের নেতাকর্মীদের আশ্রয়স্থল ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

বিভিন্ন হামলা-মামলা, বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়ে বেগম মুজিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। শেখ মুজিব যখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে নেতাদের সঙ্গে বসতেন, বেগম মুজিব সবসময় খেয়াল রাখতেন কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে। তিনি সময়মতো তাঁর মতামত দিতেন কিন্তু কখনো তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসতেন না। তিনি তাঁর বার্তাটি পৌঁছে দিতেন। মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি মায়ের দৃঢ় ভূমিকা'।

বঙ্গবন্ধু জীবনে যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন সবটাতেই বঙ্গমাতা তাঁকে ছায়ার মতো সাহায্য করেছেন। তাঁর উৎসাহে বঙ্গবন্ধু কারাগারে আত্মজীবনী লেখেন, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা*। জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অজানা ইতিহাসের সম্ভার এ গ্রন্থ দুটি। (বঙ্গবন্ধুর লেখা তৃতীয় বইয়ের নাম *আমার দেখা নয়াচীন*)। এই আত্মজীবনী সংরক্ষণে বঙ্গমাতার ভূমিকা ইতিহাস নিশ্চয়ই মনে রাখবে। ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন তুমি তোমার মনের কথাই সে সময়ে বলবে। তোমার স্বপ্নের কথা বলবে'।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আজ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর মনের কথাগুলো বলেছিলেন বলে আজ এটি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম স্থানে পৌঁছেছে। ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। এ ভাষণকে স্বীকৃতি দিয়ে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে' তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরু হয়। তারপর একরকম বন্দিজীবন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বিলাসী জীবনে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু নিজের গড়া ৩২ নম্বরের বাড়িতেই থেকে যান। সারা জীবন ছায়ার মতো স্বামীর পাশেই ছিলেন প্রচারবিমুখ মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। পর্দার অন্তরালে থেকে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে ছায়ার মতো থেকে শক্তি জুগিয়েছেন। একটি স্বাধীন দেশের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে যে নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। জাতির পিতার দীর্ঘ সংগ্রামে অনন্য ভূমিকার জন্য তিনি ক্রমেই হয়ে উঠেছেন বঙ্গমাতা।

এই মহীয়সী নারীর জীবন পরম গৌরবের। একদিকে তিনি জাতির পিতার পত্নী, শহিদ সন্তানদের জননী এবং দক্ষিণ-পূর্ব

লন্ডনে চিকিৎসারত স্বামীর পাশে বেগম মুজিব

এশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা শেখ হাসিনারও জন্মদাত্রী। তরুণ প্রজন্মের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন সংগ্রাম, শেখ মুজিবুর রহমানের কারাবাসকালে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগঠিত করা এবং তাঁর দেশপ্রেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আরো বেশি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, সংসদ উপনেতার কার্যালয়

হিরোসিমা ও নাগাসাকি ধ্বংসযজ্ঞের ইতিকথা

রেহানা শাহনাজ

আজ থেকে ৭৩ বছর আগের কথা। ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ই আগস্ট যথাক্রমে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে এক রৌদ্রস্নাত সকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী হামলা চালায়। হিরোসিমা শহরের ওপর 'লিটল বয়' নামের নিউক্লিয় বোমা ফেলে এবং এর তিনদিন পর নাগাসাকি শহরের ওপর 'ফ্যাট ম্যান' নামের আরেকটি নিউক্লিয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের ফলে হিরোসিমাতে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মারা যায়। নাগাসাকিতে মারা যায় প্রায় ৭৪ হাজার লোক। পরবর্তীতে এই দুই শহরের বোমার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় ২ লক্ষ ১৪ হাজার জন। জাপানের *দৈনিক আসাহি শিমবুন*-এর তথ্য মতে রোগের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগসমূহের ওপর হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্য গণনায় ধরে হিরোসিমায় ২ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং নাগাসাকিতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক মারা যায়। আজও জাপানের পরবর্তী প্রজন্মগুলো শরীরে বয়ে নিয়ে চলেছে পরমাণু বোমার বিষ। পরমাণু বোমায় ব্যবহৃত ভারী মৌলিক পদার্থগুলোর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্ষমতা বহুদিন, যা শুধু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মানুষেরই শারীরিক বিকৃতি ঘটায় না প্রাণীকূলকেও ধ্বংস করে এবং সেইসঙ্গে পানি ও মাটিকে ধ্বংস করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা ছিল মিত্রশক্তির অনুকূলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সত্যিই কি এ বোমা ফেলার প্রয়োজন ছিল! ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। জুলাই মাসে মিত্রশক্তির দেশগুলো 'পট্সডামে' এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ই আগস্ট থেকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর কথা ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এক কথায় জাপানের আত্মসমর্পণ ছিল শুধু সময়ের ব্যাপার। ২ কোটি মানুষের প্রাণ এবং বিশ্বের বিরাট ক্ষতির বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী শক্তি জার্মানিকে পরাজিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মত্যাগ সারা বিশ্বের মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এক আলাদা বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। একইসঙ্গে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল মিত্রশক্তি এবং অন্যতম মিত্রশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। হিটলারের জার্মানি ইউরোপের একের পর এক দেশ ধ্বংস করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্র নেতৃত্ব যুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বার বার আবেদন জানায়। সে সময় যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলত তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের এত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হতো না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব চেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি

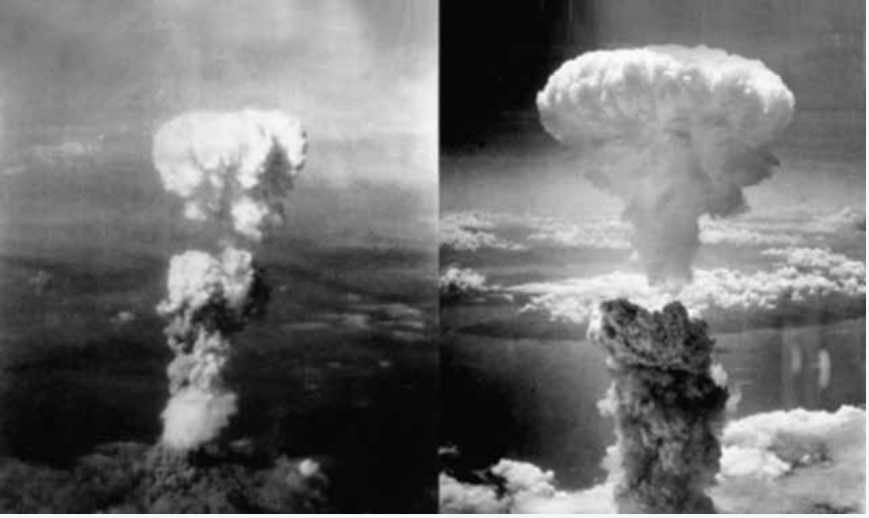

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব নিয়ে অতিমাত্রায় চিন্তিত ছিল। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নাসের উক্তি ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক বোমা থাকার প্রয়োজন জাপানকে পরাজিত করার জন্য নয়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে রাশিয়াকে ভয় দেখিয়ে বেশি সুযোগ আদায় করার জন্য'। বিশ্বে এত যে প্রাণহানি, এত যে বিপর্যয় ঘটেছিল এর জন্য কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুতপ্ত ছিল না।

গবেষকরা বলছেন, জার্মানি থেকে ফ্যাসিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ পরিস্থিতিতে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে পারমাণবিক বোমা তৈরি প্রকল্প গ্রহণের আবেদন জানান। আসলে সে সময় বিজ্ঞানীদের কাছে খবর ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানি ঠিক এ ধরনের গবেষণা নিজের দেশে চালাচ্ছে। আইনস্টাইন, জিনার্ডের মতো পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আবেদনপত্রে এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'এ শক্তি কেবল ব্যবহার করা হবে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণের জন্য। এ শক্তি কখনোই ব্যবহার করা যাবে না সামরিক প্রভাব বিস্তারের জন্য। জার্মানি আত্মসমর্পণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের এক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা তৈরিতে সফল হয়। একইসঙ্গে বিজ্ঞানীরা এই আণবিক বোমা ধ্বংস করায় ক্ষমতার কথা জানিয়ে তা ব্যবহার না করার জন্য আবেদন জানিয়ে মার্কিন সরকারকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এসব আবেদন-নিবেদনে মার্কিন রাষ্ট্রনেতারা কোনো কর্ণপাত করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল বিশ্ব। তাহলো আণবিক বোমার বিপদ। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরু হয় শান্তির আন্দোলন। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় ঘটেছে। তা সত্ত্বেও বিশ্ববাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিদের আক্রমণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন পর্যুদস্ত, তারা নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পরে। এ সময় পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশের ভিত নড়ে উঠে। পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা পর্যুদস্ত না হতো পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা এত তাড়াতাড়ি আসত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে আজও বিশ্ব মুক্ত হয়নি। গেল কয়েকটি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে একে ধ্বংস করেছে যুগোস্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক। এখন লক্ষ্য কিউবা, কোরিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইরান ও সিরিয়া।

মার্কিন সাম্রাজ্যের অন্যতম মিত্র ইসরায়েল এখন লেবানন, সিরিয়া প্যালেস্টাইনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের লোভে বিশ্বের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য এ কথা বলেছেন যে– পুঁজিবাদ যতদিন না ধ্বংস হবে ততদিন বিশ্ববাসী যুদ্ধ থেকে মুক্ত হবে না।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং যুদ্ধের বীভৎসতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে স্মরণ করতে হবে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির মর্মন্তুদ বিপর্যয়ের কথা ভাববার সময় এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে আহ্বান করা হয়েছিল আত্মসমর্পণ করার জন্য, জাপান তা করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল সে কারণেই কিন্তু হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলেনি। ফেলেছে বিশ্বকে দেখাতে 'আমিই সেরা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী দেশ জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যে বড়ো যুদ্ধটি হয়েছিল, সে যুদ্ধটির নাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বে বহুদেশে যুদ্ধ এখনো হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি কোনো যুদ্ধ। বিশেষ করে হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামের দুটি শহরে দুইদিন বোমা হামলার কথা বিশ্ব আজও স্মরণ করে। পারমাণবিক বোমা হামলার কথা স্মরণ করে ৬ই আগস্ট হিরোসিমা দিবস ও ৯ই আগস্ট নাগাসাকি দিবস পালিত হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ই-পেমেন্ট সিস্টেম চালু

করদাতাদের অনলাইনভিত্তিক রিটার্ন দাখিলের সুবিধার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'ই-পেমেন্ট' সিস্টেম চালু করেছে। ১৭ই জুলাই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম ই-পেমেন্ট সিস্টেমের শুভ উদ্‌বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম উল্লেখ করেন যে, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে প্রণীত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনলাইনভিত্তিক। এটির সফল বাস্তবায়নের জন্য ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে-IVAS (Integrated VAT Administration System) চালুর কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। IVAS-এর ১৬টি মডিউল। এর মধ্যে ইতোমধ্যে Registration, Return ও Taxpayer Account মডিউল তিনটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মডিউলগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিবেদন: আসমা খাতুন

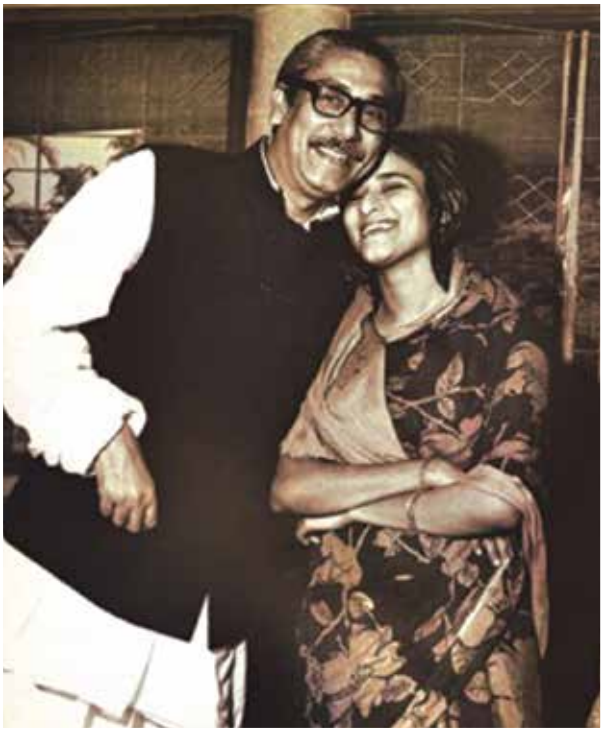

পিতার একান্ত সান্নিধ্যে শেখ হাসিনা

শোকের মাসে জন্মশতবর্ষে জাতির পিতা শেখ মুজিব স্মরণে

রহিম আব্দুর রহিম

'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব– আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'– উক্তিটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। এ উক্তি প্রমাণ করে এই ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর ও নিবিড়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই খণ্ডের (বাংলাদেশ) মানুষরা পরাধীন। তিনি সব সময় নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত বাঙালি জাতির পাশে দাঁড়িয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি দেখিয়েছিলেন বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি মুক্তি পাগল বাঙালি জাতি বিমানের সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুকে দেখেই আকাশ ফাঁটিয়ে গর্জে উঠেছিল, 'জয় বাংলা'। তাঁর সাহসী সংগ্রামের জন্য বাঙালি আজ স্বাধীন। তাঁর সঠিক নেতৃত্বের জন্যে আমরা আজ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সম্মান পেয়েছি। শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ সম্পাদিত *আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম* সংকলনের ভূমিকায় পাওয়া যায়, 'পাকিস্তান সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে বার বার কারাবন্দি করেছেন। রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ফাঁসির মঞ্চে তুলতে চেয়েছে। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল বাঙালি জাতির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় আপোশহীন সংগ্রাম। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতির প্রতিষ্ঠা'।

শেখ মুজিবুর রহমান হলেন একইসঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাংলাদেশের স্রষ্টা, যিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন মানবদরদি, সাহসী ও সংগ্রামী এক বীর পুরুষ। তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে তিনি আবার বন্দি হন। প্রায় আট বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই ছয় দফা দাবিই ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। তৎকালীন সামরিক সরকার এজন্য তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে। দীর্ঘদিন কারাভোগের পর ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রবল গণ-অভ্যুত্থান শুরু হলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একক বিজয় অর্জিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ এখনো বাঙালি জাতির পাথেয়। চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ'। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে মূলত মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ, নিরপরাধ ঘুমন্ত জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওই রাতেই তারা হাজার হাজার বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তান বাহিনী। এর পূর্বেই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীন হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব জনতার চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি লন্ডন ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরে তিনি তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতি হন। তিনি ছিলেন নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের প্রাণের নেতা, শান্তির অগ্রদূত। যে কারণে তাঁকে ১৯৭৩ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদ 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করে।

এবার ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে একদল উচ্চাভিলাষী সেনাসদস্য। বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশায় বহুবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছেন। ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায় আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। রাজনীতির মহাকবি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, কালজয়ী এই মহাপুরুষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ আরো অনেকে ওই রাতে নির্মমভাবে হত্যার শিকার হন। ওই সময় বিদেশে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর

দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। সে সময় পরিবেশ এতটাই দুর্যোগপূর্ণ ছিল যে, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করার মতো কোনো মানুষ ছিল না। তবে হত্যাকাণ্ডের ৬৫ দিন পর অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২০শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে প্রথম এক স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। (সূত্র: *ভোরের কাগজ*, ১৭ই আগস্ট, ১৯৯৬) কবি সাহিত্যিক-শিল্পীরাই সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ১৯৭৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকারের সাবেক শিক্ষাসচিব কবির চৌধুরী। (সূত্র: সাইফুল্লাহ মাহামুদ দুলাল, *শিল্প সাহিত্যে শেখ মুজিব*, ঢাকা, ১৯৯৭) ১৯৭৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির সকালে সামরিক শাসনের কড়া পাহারার মধ্যে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির কবিতা পাঠের আসরে কবি নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুর স্মরণে এক ঐতিহাসিক কবিতা পাঠ করে সকলকে সাহসী করে তুলেন। এরপর ১৯৭৭ সালে তৎকালীন *সমকাল* পত্রিকায় কবি মোহাম্মাদ রফিকের কবিতা, ১৯৭৮ সালের ৩রা নভেম্বর এই পত্রিকায় প্রকাশিত আবুল ফজলের গল্প 'মৃতের আত্মহত্যা'তে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের শৈল্পিক প্রতিবাদ আসে। আবার ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে একুশের স্মরণিকা 'জয়ধ্বনি'তে কবি কামাল চৌধুরী 'জাতীয়তাময় জন্ম-মৃত্যু'সহ হায়াৎ মাহমুদ, অন্নদা শংকর রায়, রাহাত খান, মহাদেব সাহা'রাও তাঁদের শৈল্পিক প্রতিবাদ চালিয়ে যান।

বর্তমান শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকির উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নানা কাহিনি বিজড়িত হাসিকান্না, দুঃখ-বেদনা নিয়ে রচিত বিভিন্ন লেখকের নাটক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংগ্রহ শুরু করেছে। এর মধ্যে 'বাইগাড়পাড়ের বাঙালি' নাটকটিতে বঙ্গবন্ধুর সকল আদর্শ এবং সকল অঙ্গনের নির্যাস উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে বাংলা একাডেমি জাতির পিতাকে নিয়ে শত বই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতির পিতা ছিলেন যেমন দেশপ্রেমিক তেমনি ছিলেন মানবদরদি। এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, 'শেখ মুজিব আমার পিতা' শিরোনামের এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন স্কুল ছুটির সময় হতো, তখন আম গাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে, দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তাঁর খোকা গায়ে চাদর জড়িয়ে আসছে। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলের শতছিন্ন কাপড় দেখে সবই তাকে দিয়ে এসেছেন'।

মাত্র চার বছর সাত মাস পাঁচ দিন ক্ষমতায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপরই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শত ব্যস্ত জীবনের অধিকারী হয়েও ছিলেন পরিবারের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক, দায়িত্বশীল এবং সন্তানদের পরমবন্ধু।

১৯৫৯ সালের ১৬ই এপ্রিল জেলখানা থেকে তিনি তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন নেছা মুজিব (রেণু)কে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'রেণু, আমার ভালোবাসা নিয়ো, ঈদের পরে আমার সাথে দেখা করতে এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসো নাই, হাসিনাকে মন দিয়ে পড়তে বলিও। কামালের স্বাস্থ্য মোটেই ভালো হচ্ছে না, ওকে নিয়মিত খেতে বলিও। জামাল যেন মন দিয়ে পড়ে আর ছবি আঁকে। এবার একটা ছবি এঁকে যেন নিয়ে আসে, আমি দেখব। রেহানা খুব দুষ্টু, ওকে কিছুদিন পর স্কুলে দিও জামালের সাথে। যদি সময় পাও নিজেও একটু লেখাপড়া করিও। একাকী থাকতে কষ্ট প্রথম প্রথম হতো, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, কোনো চিন্তা নাই। বসে বসে বই পড়ি। তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ইতি তোমারই মুজিব।' (বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর *নিরীক্ষায়* প্রকাশিত মোনায়েম সরকারের নিবন্ধ) জেলখানা থেকে প্রেরিত এই পত্রটি প্রমাণ করে তিনি সাহসী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দায়িত্বশীল অভিভাবক, একজন মনোবিজ্ঞানী, বিশ্লেষক ও দার্শনিক।

১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরে প্রফেসর ড. আলী আসগর এক আলোচনায় বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু যেদিন মারা যান সেদিন আমি বিদেশে ছিলাম। সকালে একটি হোটেলে নাস্তা করতে গেলে, অন্য একজন গ্রাহক আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বাঙালি? বললাম, হ্যাঁ। এটা বলা মাত্রই ওই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন, চোখে-মুখে ঘৃণার ছাঁপ। মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছে, 'বাঙালিরা বেইমান, যিনি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এনে দিলেন, পৃথিবীতে দেশের মানচিত্র অঙ্কন করল, তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হলো!' এই বক্তব্য স্পষ্ট করে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে তারা নিজেরাই শুধু অপরাধী হয়নি, একটি জাতির মুখেও কলঙ্ক মেখেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের খবরটি যখন বেতারে ঘোষণা হয়, তখন বিশিষ্ট লেখক আবু জাফর শামসুদ্দিন তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন, 'মৃত বঙ্গবন্ধু, জীবন্ত বঙ্গবন্ধুর চেয়েও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হবেন'। সেটাই হয়েছে। আর এ আবির্ভূত বঙ্গবন্ধুই হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর অনুসারীদের সমষ্টিগত শক্তিশালী সাহসী হাত। যে হাত বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে, হচ্ছে। পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উন্নয়ন রয়েছে অব্যাহত।

সারা বিশ্বে এই মহান নেতার ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ইতিহাস। এরা চেয়েছিল উলটো পথে ইতিহাসের চাকা ঘোরাতে, পারেনি। বরং উজ্জীবিত ইতিহাস প্রখর ও সমৃদ্ধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ, স্বাধীনতা মানেই বঙ্গবন্ধু, বাংলার ইতিহাস মানেই মুক্তিদাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসে অমর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তুমি, গভীর ভালোবাসা ও পরম শ্রদ্ধায় তোমাকেই সর্বদা স্মরণ করি।

লেখক: শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার

ইসলামের দৃষ্টিতে কোরবানি

মুহাম্মদ ইসমাঈল

কোরবানি হলো মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুসলিম জাহানের ওপর এক বিশেষ নিয়ামত। শব্দটি আরবি। যার আভিধানিক অর্থ– ত্যাগ করা, উৎসর্গ করা। কোরবানিকে আরবি ভাষায় 'উযহিয়া' বলা হয়। 'উযহিয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঐ পশু যা কোরবানির দিন জবেহ করা হয়।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কোরবানি হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে খাস নিয়তে নির্দিষ্ট দিনে কোনো হালাল জন্তু জবেহ করা।

কোরবানির ইতিহাস মুসলিম মিল্লাতের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর আল্লাহর সাথে উৎকৃষ্ট প্রেমের ইতিহাস। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার কাছে পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন। হিজরত করে ইব্রাহীম (আ.) মিসর পৌঁছান। মিসরের বাদশাহ ইব্রাহীম (আ.) তার স্ত্রী সারার খেদমতে স্বীয় কন্যা হাজেরাকে দান করলেন। বিবি সারা হাজেরাকে স্বামী ইব্রাহীমের খেদমতের জন্য দান করলেন। এতে ইব্রাহীম (আ.) হাজেরাকে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। আর হাজেরার গর্ভেই ইসমাইল (আ.) এর জন্ম হয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে স্বপ্নে দেখান স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করেছেন। নবিদের স্বপ্ন ছিল ওহি তথা প্রত্যাদেশ। তাই আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য ইসমাইল (আ.) কে তিনি স্বপ্নের কথা জানালেন এবং পুত্রের মতামত কী তা জানতে চাইলেন। ইসমাইল (আ.) জবাবে পিতাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা আপনি বাস্তবায়ন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন ইনশাল্লাহ। পিতা-পুত্রের এরকম অটল সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কোরবানি করার জন্য ইব্রাহীম (আ.) ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে রওনা হলেন।

বিভিন্ন তাফসীর ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, শয়তান হযরত ইসমাইল (আ.) কে তিনবার প্রতারিত করার চেষ্টা করে। আর ইসমাইল (আ.) প্রত্যেকবারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেন। অতঃপর পিতা-পুত্র যখন এ অভিনব ইবাদত পালন করার জন্য কোরবানির মাঠে পৌঁছালেন তখন ইসমাইল (আ.) পিতাকে বললেন, হে পিতা! আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে দিন যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরনের পোশাক সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ফোঁটা আপনার গায়ে না পড়ে। আমার রক্ত দেখলে আমার মা শোকে ব্যাকুল হয়ে

যেতে পারেন। পরিশেষে ইসমাইল (আ.) কে বেঁধে ফেলা হয়। তাঁর পিতা ছুরি চালালেন। কিন্তু গলা কাটল না। ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা দুম্বা পেশ করলেন। তা দিয়ে ইব্রাহিম (আ.) কোরবানি আদায় করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ইব্রাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। তোমার কোরবানি কবুল হলো। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। সেদিন থেকেই প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের ওপর আল্লাহর খলিলের এ মহান উৎসর্গকে অমর করে রাখার জন্য প্রতিবছর জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখে কোরবানি করা ওয়াজিব।

কোরবানি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত বান্দার ওপর পালনীয় একটি ইবাদত। হযরত ইবনে বুরাইদ (রা.) তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে নামাজে যেতেন না এবং ঈদুল আজহার দিন নামাজের পূর্বে কিছু খেতেন না। নামাজ থেকে ফিরে এসে কোরবানির গোশত খেতেন। -(তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ)

প্রথমত নিয়ত খাঁটি হওয়া আবশ্যক। কোরবানির পশু ক্রয় করার সময় এরূপ ধারণা করা উচিত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কোরবানি দেওয়া হবে। আর জবাই করার মুহূর্তে এ ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। এ ধারণাই হলো নিয়ত। নিয়তের জন্য কোনো ভাষাতেই পৃথক কোনো বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। যে যে কোরবানি দিবে তাদের প্রত্যেকের মন এক হতে হবে– একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকলে অর্থাৎ ছেলেমেয়ের অজুহাত দিলে তার কোরবানি হবে না।

গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, মহিষ, উট–এ প্রকার গৃহপালিত প্রাণী ছাড়া কোরবানি নাজায়েজ। গরু, মহিষ ও উট এক সাথে সাতজন পর্যন্ত শরিক হয়ে কোরবানি করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, কারো অংশে কম না হয় এবং কারো যেন গোশত খাওয়ার নিয়ত না হয়। এক বা একাধিক ভাগ আকিকারও থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিছক গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকলে বা কারো ভাগে কম হলে কোরবানির মাহাত্ম্য থাকে না। সুতরাং প্রথমত নিয়ত সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত ঠিকমতো ভাগ করার জন্য দাড়িপাল্লা ব্যবহার করা উচিত।

কোরবানির আনন্দ বয়ে যাক প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের হৃদয়ে। বয়ে যাক আনন্দ সবার ঘরে ঘরে। আমিন।

লেখক: শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

জমজমাট ই-কর্মাস ব্যাবসা

করোনাকালে দেশে স্থানীয় ক্রেতারা এখন অনলাইনমুখী। ফলে জমজমাট ই-কমার্স। বাড়ছে কেনাকাটা। লেনদেনও বাড়ছে বহুগুণে। জানা গেছে, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এখন অনলাইনে বিক্রি বেড়েছে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এ খাতে প্রায় ১ হাজার ২০০ প্রতিষ্ঠানে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আবার চার লাখ নারী উদ্যোক্তা ফেসবুকে পণ্য বিক্রিতে সক্রিয়। দ্রুতগতিতে হচ্ছে ব্যবসা সম্প্রসারণ। ফলে বাংলাদেশে ই-কমার্সের বাজার দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। চলতি বছর দুই বিলিয়ন ও ২০২৩ সালে তিন বিলিয়ন ডলার ছাড়ানোর তথ্য দিয়েছে জার্মানভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টা।

এ প্রসঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, সরকারের দেওয়া বেশ কিছু নীতি সহায়তার ফলেই এখন সাফল্যের মুখ দেখছে ই-কমার্স। এক্ষেত্রে পণ্য ডেলিভারিকেও সরকার জরুরি সেবা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমনকি করোনাকালে এবার কোরবানির ঈদ সামনে রেখে পশুর হাটও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ বছরে ই-কমার্সে ৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলেও মনে করেন প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এক কথায় করোনাকালে ই-কমার্সে বিপ্লব হয়ে গেছে।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

যুক্তফ্রন্ট ও কোয়ালিশন সরকারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

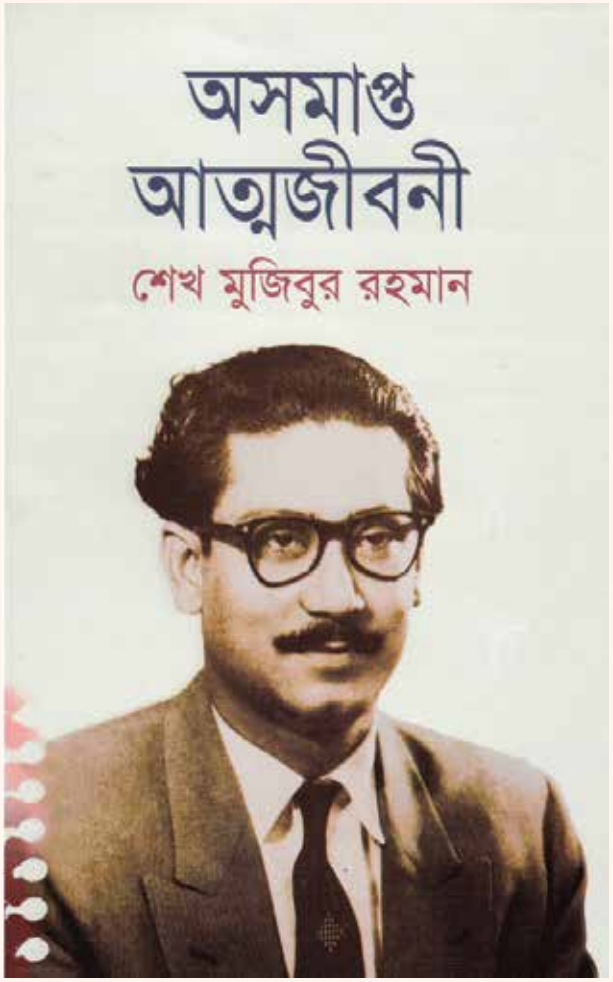

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের ৮ তারিখে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করে। ২রা এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। মুসলিম আসন ২৩৭টির মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। এই ২২৩টির ভেতর আওয়ামী লীগ এককভাবেই পায় ১৪০টি আসন। শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি পায় ৩৪টি। আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর লেখায় উদ্ধৃত হয়েছে–

নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে শহীদ সাহেব বিবৃতির মারফতে বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগ নয়টির বেশি সিট পেলে আমি আশ্চর্য হব'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা-২৫৭)

মুসলিম লীগের এই দুরবস্থায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে এবং এও প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র ধর্মকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা রাজনীতি এদেশের মানুষ মেনে নেয়নি। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মাঝে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সর্বসম্মতিক্রমে প্রাদেশিক পরিষদের নেতা নির্বাচিত করা হয়। তবু তাঁর পার্টির সুবিধাবাদী কিছু নেতার কারণে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়। সে কারণে আওয়ামী লীগের কেউ প্রথম দফায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

'হক সাহেব শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বলেছেন, 'আমি শেখ মুজিবকে আমার মন্ত্রীত্বে নিব না'। তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের কাকে নেওয়া হবে না হবে সেটা তো আমি আর ভাসানী সাহেব ঠিক করবো; আপনি যখন বলেছেন নান্না মিয়াকে ছাড়া আপনার চলে না, তখন আমরাও তো বলতে পারি শেখ মুজিবকে ছাড়া আমাদের চলে না। সে আমাদের দলের সেক্রেটারি। এ সকল কথা বললে পার্টি থেকে বলতে পারে'। আমি শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বললাম, 'আমাকে নিয়ে গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। আমি মন্ত্রী হতে চাই না। আমাকে বাদ দিলে যদি পুরা মন্ত্রিসভা গঠন করতে রাজি হয়, আপনারা তাই করেন'। আমরা বসে আলাপ করছি, প্রায় এক ঘণ্টা পরে হক সাহেব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি ছয়জনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান এবং মুজিবকেও নিতে রাজি আছেন। ভাসানী সাহেব বলে দিলেন, 'আওয়ামী লীগ যখন যোগদান করবে, আওয়ামী লীগের সব কয়জনই একসাথে যোগদান করবেন। এভাবে ভাঙা ভাঙাভাবে যোগদান করবে না'। পরদিন হক সাহেব নিজেসহ চারজন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। হক সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্যরা হলেন– আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া (কেএসপি) এবং আশরাফউদ্দিন চৌধুরী (নেজামে ইসলাম)। লাট ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল হল, 'স্বজনপ্রীতি চলবে না', 'কোটারি চলবে না', এমনি নানা রকমের স্লোগান। যদি একসাথে পুরা মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করতো তা হলে লক্ষ লক্ষ লোক অভিনন্দন জানাত। মনে হল একদিনের মধ্যে গণজাগরণ নষ্ট হয়ে গেছে। জনসাধারণ ঝিমিয়ে পড়েছে।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা-২৬০ ও ২৬১)

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে সকাল ১১টায় ঢাকায় গভর্নর হাউসের দরবার হলে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পূর্ব পাকিস্তানের নয়া মন্ত্রিসভার চারজন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবর্গ, হাইকোর্টের বিচারক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঠিক বেলা ১০.৫৫ মিনিটে নয়া মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিপরিষদের অপর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে দরবার কক্ষে প্রবেশ করেন। বেলা ১১টায় গভর্নর চৌধুরী খলিকুজ্জমান দরবার হলে আগমন করলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এ কে ফজলুল হক নিজেই পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন। ফজলুল হকসহ তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণপত্রে বাংলায় স্বাক্ষর করেন।

যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ক্ষমতাধর রাজনৈতিক পার্টি আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সরকার বেকায়দায় পড়ে যায়। তখন একদিন

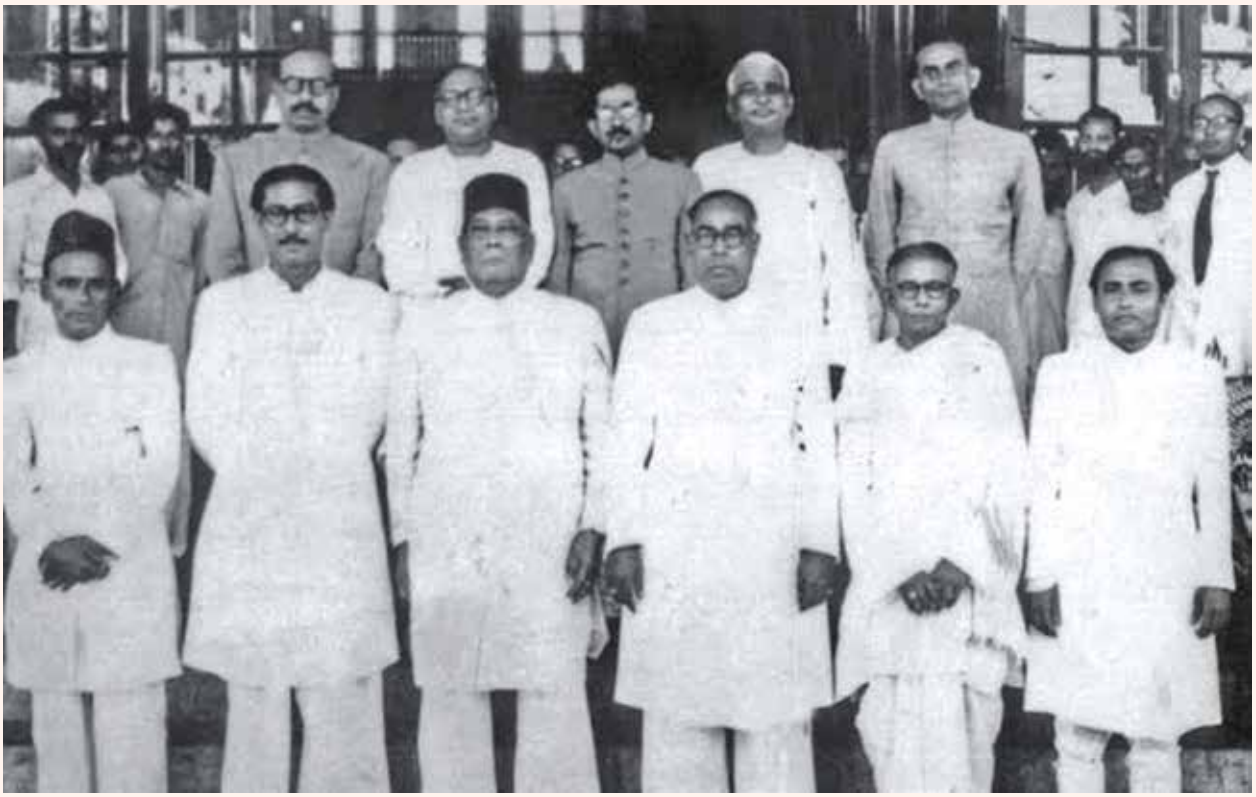

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান শেরে বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি স্নেহের সুরে শেখ মুজিবকে বললেন–

তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই। তুই রাগ করে 'না' বলিস না। তোরা সকলে বসে ঠিক কর, কাকে কাকে নেয়া যেতে পারে। *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা-২৬২)

এরপর শেরে বাংলার এক ভাগিনেয় মাহবুব মোর্শেদ (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি), কফিলুদ্দিন চৌধুরী ও মির্জা আবদুল কাদের সর্দারের মধ্যস্থতায় আওয়ামী লীগ সমঝোতায় আসে এবং ১৫ই মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। আওয়ামী লীগ থেকে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১০ জন শেরে বাংলার মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট দপ্তর দেওয়া হলো। পরে এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট দপ্তর আলাদা করে অন্যজনকে দেওয়া হয়। এতে তিনি রেগে গিয়ে শেরে বাংলাকে বলেছিলেন, 'না না, ব্যাপার কী? এ সমস্ত কী হচ্ছে, আমরা তো মন্ত্রী হতে চাই নাই। আমাদের ভিতরে এনে এ সমস্ত ষড়যন্ত্র চলছে কেনো'? শেখ মুজিবের কথার উত্তরে শেরে বাংলা বলেছিলেন, 'করবার দে আমার পোর্টফলিও তোকে দিয়ে দেব, তুই রাগ করিস না, পরে সব ঠিক করে দেব'। পোর্টফলিও আর ঠিক করা হয়নি। তাঁরা যেদিন শপথ গ্রহণ করেন সেদিনই আদমজীতে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মাঝে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়, এতে পাঁচ শতাধিক লোক নিহত হয়। এর আগে চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে এক ভয়াবহ দাঙ্গা হয় এবং ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেটে জেলের কর্মচারীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের গোণ্ডগোল হয়, এতে একজন নিহত হয়। অপরদিকে নিউইয়র্ক টাইমস-এ শেরে বাংলার একটা সাক্ষাৎকার বিকৃত করে মুদ্রিত হয়। সেখানে বলা হয়, তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চেয়েছেন। এ সকল ঘটনার অজুহাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসন বাতিল করে গভর্নরের শাসন চালু করে। দাঙ্গাকারী হিসেবে অভিহিত করে গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। শেরে বাংলাকে দেশদ্রোহী বলে নজরবন্দি করা হয়। সারা পূর্ব পাকিস্তানে গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় তিন হাজার নেতাকর্মীকে। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে *দৈনিক আজাদের* একটি নিবন্ধে বলা হয়–

'৯২(ক) ধারা জারী করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার করা হইবে। গভর্নরের শাসন প্রবর্ত্তনের পর প্রদেশে কয়েকশত রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ইহার পর কয়েকবার পূর্ব্ববঙ্গ সফর করিয়া প্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার ও পার্লামেন্টারি শাসন প্রবর্ত্তনের উপযোগী কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

অতঃপর অক্টোবর মাসে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দেয় ও কেন্দ্রে জনাব মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে যে পুরাতন মন্ত্রিসভা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহারই নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়।

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সে সময় জুরিখে ছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ২০শে ডিসেম্বর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। কিছুদিন পর প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য জনাব আবু হোসেন সরকারও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।

যুক্তফ্রন্টের দুইজন সদস্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের ফলে স্বাভাবিকভাবে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার সম্পর্কে প্রদেশবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চয় হয়। এই সময় আবার যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব লইয়া আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলের মত বিরোধ দেখা দেয়। নেতৃত্বের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য

১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫৫) পূর্ব্ববঙ্গ পরিষদ ভবনে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পরে প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহের পক্ষ হইতে পরস্পর বিরোধী দাবী উত্থাপন করা হয়। জনাব ফজলুল হকের অনুসারীদের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, দলের বৈঠকে জনাব হকের উপরে আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অপর দিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, বৈঠকে জনাব হকের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে ও জনাব আতাউর রহমান খান দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরে অবশ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দাবী করা হয় নাই। জনাব ফজলুল হকই যুক্তফ্রন্টের নেতা বলিয়া বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি পাইয়াছেন'। (*দৈনিক আজাদ*, ৪ঠা জুন ১৯৫৫)

গভর্নর শাসনব্যবস্থা চালু থাকে ১৯৫৫ সালের ২রা জুন পর্যন্ত। ৩রা জুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ববঙ্গে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার করে পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঘোষণায় আরো বলা হয়–

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যুক্তফ্রন্ট পার্টির নেতা জনাব এ কে ফজলুল হককে স্বাভাবিকভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করার কথা। কিন্তু গণপরিষদ সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে দেশে উদ্ভূত সমস্যার জন্য জনাব ফজলুল হক দেশের ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে তাঁহার সকল সময় ও শক্তি নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য একজন মনোনীত ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা ন্যাস্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (*দৈনিক আজাদ*, ৩রা জুন ১৯৫৫)

১৯৫৫ সালের ৬ই জুন সকাল ১১টায় পূর্ববঙ্গের গভর্নর হাউসে ফজলুল হক মনোনীত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার তাঁর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সালাম খান, যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, যুক্তফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক ও নতুন মুখ হাশিমউদ্দিন আহমদসহ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শাহাবুদ্দীনের নিকট শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পূর্বে আবু হোসেন সরকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর কাছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। আওয়ামী লীগ এই মন্ত্রিসভা গঠনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

১৯৫৬ সালের মার্চের ২৩শে তারিখে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন এবং তদানীন্তন সময়েই এ কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। এর কিছু দিন পরেই ২৬শে মে রাতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জ্জা পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩ ধারা জারি করে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। তবে মাত্র ৬ দিন পর ১লা জুন ১৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা হয় এবং আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা ১৯৫৬ সালের ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত স্থায়ী থেকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করে। এই পদত্যাগপত্র ১লা সেপ্টেম্বর কার্যকরী হয়।

এরপর গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় নেতা, পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান ঘোষিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার প্রাথমিকভাবে পাঁচজন সদস্য মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিক কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন আতাউর রহমান খান। আর অন্যদের মাঝে শপথ নিলেন– আবুল মনসুর আহমদ (আওয়ামী লীগ), শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ), কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র) ও মাহমুদ আলী (গণতন্ত্রী) এবং এদের সকলের মাঝে দপ্তরও বন্টন করা হয়। অপর দিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বারোজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে আটজনসহ তিনি শপথ গ্রহণ করেন ১২ই সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ৬ই সেপ্টেম্বর শপথ নেওয়া পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য আবুল মনসুর আহমদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

কয়েক দিন পর আতাউর রহমান খানের প্রাদেশিক সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের তালিকাও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিষয়ে পত্রিকার একটা রিপোর্টে বলা হয়–

'আগামী মোঙ্গলবার আওয়ামী লীগের ৪ জন জনাব খয়রাত হোসেন, জনাব মছিউর রহমান, জনাব আবদুর রহমান খান, জনাব সৈয়দ আকবর আলী অথবা ক্যাপ্টেন মনসুরকে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কংগ্রেস হইতে মিঃ মনোরঞ্জন ধর, মিঃ শরৎচন্দ্র মজুমদার এবং ইউপিপি হইতে মিঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত একই দিনে শপথ গ্রহণ করিবেন'। (*দৈনিক আজাদ*, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬)

পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর গভর্নর হাউসে অন্য ছয়জন মন্ত্রীর সাথে এম মনসুর আলী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

ইতোপূর্বে শপথ গ্রহণকারী প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মাঝে দপ্তর পুনঃবণ্টন ও নতুন মন্ত্রীদেরকে দপ্তর প্রদান বিষয়ে ১৯৫৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সরকার গেজেট প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের ৮ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর মেজর জেনারেল প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জ্জা ও সামরিকবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কজন মন্ত্রীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার চার বছর দেশ শাসন করেছিল। এই সময়ে সাতবার মন্ত্রিসভার ভাঙা-গড়া হয় এবং তিনবার কেন্দ্র থেকে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের ষড়যন্ত্র, পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের ক্ষমতার লোভ এবং যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুই শরিক আওয়ামী লীগ ও শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এই যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেয়।

লেখক: কবি, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

কোরবানি ঈদের অনন্য শিক্ষা

খান চমন-ই-এলাহি

অন্য বছরের থেকে এবছরের পবিত্র হজ ও কোরবানি আলাদা। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মতো এমন সংক্রামক ব্যাধি ইতোপূর্বে মুসলিম ও মানবসভ্যতা আর মোকাবিলা করেনি। তাই হাদিস অনুযায়ী যার যার অবস্থানে থাকতে হবে। অহেতুক একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া-আসা করা যাবে না। স্থানীয়ভাবে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে। নিজের দেশকে রক্ষা করাও ইমানের অঙ্গ। আল্লাহর রাসুল মুহম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করার সময় মাতৃভূমি মক্কার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। মুশরিকরা বাধ্য না করলে তিনি মদিনায় হিযরত করতেন না। বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য, মুসলিম উম্মাহ ও মানবসভ্যতা রক্ষার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কোরবানির ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে। যাতে পরিবার বা অন্য কারো কোনো কষ্ট না হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ– উপদেশ মান্য করে বাংলাদেশকে সুরক্ষা দেওয়া নাগরিক হিসেবে সকলের কর্তব্য। এটিও সুশিক্ষার অংশ।

সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব অনুষ্ঠান বিদ্যমান। কোরান হাদিসে বিশ্বাসী মুসলমান তার বাইরে নয়। নবি মুহম্মদ (স.) দেখানো পথে শরিয়ত অনুযায়ী কোরবানি ও হজ পালন ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা না মানলে, না করলে শুধু গোনা বা পাপ-ই হবে না, ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসে ছেদ ঘটবে। যা কোরান হাদিস ইজমা ও কিয়াস দ্বারা নিন্দনীয় ও প্রশ্নবিদ্ধ।

পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল-হাবিলের সময়ে কোরবানির শুরু। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরবানির প্রচলন ছিল। হযরত নূহ (আ.) কোরবানির গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) কোরবানিকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। বর্তমানে আমরা যে কোরবানি অনুসরণ করি, তাহলো সেই কোরবানি যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পিতা-পুত্রের পরস্পরের সম্পর্ক ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা হিসেবে আমাদের কাছে এসেছে।

কোরবানির ঈদ বা বক্রি ঈদের প্রভাব ও করণীয় অনেক বেশি। এ ঈদ 'ঈদ-উল-আজহা' নামে জিলহজ মাসের ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১০, ১১ ও ১২ তারিখ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। পবিত্র হজে যাওয়া প্রত্যেক হাজিকে অবশ্যই কোরবানি করতে হয়। অন্য মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'সামর্থ্য' থাকার শর্তে কোরবানি করতে হয়। অর্থাৎ সকল মুসলমানকে কোরবানি করতে হয় না। তবে কোরবানির হক ও তাৎপর্য গভীরভাবেই সকল মুসলমানদের কাছে পৌঁছে যায়– যেতে হয়।

কোরবানি কী? ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা বা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ বা বিসর্জন করা হয়, তা-ই কোরবানি। একটু অন্যভাবে বলা যায় ঈদুল আজহার দিন যে পশু জবেহ করা হয় তা-ই কোরবানি। পবিত্র কোরানে কোরবানি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম কর এবং কোরবানি কর।' আল্লাহ তায়ালা নামাজের মতো কোরবানির গুরুত্বও তুলে ধরেছেন, যাতে আমরা এর তাৎপর্য অনুভব করি। তবে কোরবানির ইতিহাস চৌদ্দশত বছর বা পাঁচ হাজার বছরের নয়। মানব সৃষ্টির সাথে কোরবানির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র

হাবিল-কাবিলের সময়েই কোরবানির প্রথা শুরু হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেমন সৃষ্টি হতে থাকে, তেমনি কোরবানির ধারণাও তেমনি পরিবর্তিত হতে থাকে। কোরবানির পশু জবেহ করা বা জবেহ করে পুড়িয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়াসহ নানা রকমের ব্যবস্থা ছিল কোরবানিতে।

মুসলমানদের তাগিদ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আল ইমরানের ৯৫ আয়াতে বলেছেন, 'বল, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, অতঃপর একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমী মিল্লাতের অনুসরণ কর।'

কোরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হয়। দেশ ও জাতি এ কোরবানির মাধ্যমে উপকৃত হয়। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় হয় এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়। প্রবৃদ্ধি বাড়ে। কোরবানি সম্পর্কে তাই পবিত্র কোরানের সূরা হজের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

'আল্লাহর কাছে ইহাদের (কোরবানির) পশুর মাংসও পৌঁছায় না, ইহার রক্তও না। তবে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া পৌঁছিয়ে থাকে।'

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, হে লোক সকল, জেনে রাখ, প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কোরবানি করা আবশ্যক (মিশকাত)। সামর্থ্যবানদের কোরবানি অবশ্যই করা উচিত। এতে একদিকে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়, অন্যদিকে গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটারও ব্যবস্থা করা হয়। নবিজী (সা.) কোরবানির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটও না আসে'।

কোরবানি এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজ আদায়কালে একশ উট কোরবানি করেন। তন্মধ্যে তেষট্টিটি নিজ হাতে অবশিষ্টগুলো নবি (সা.)-এর আদেশক্রমে হযরত আলী (রা.) জবেহ করেন।

মিশকাত শরিফের এক হাদিসে এসেছে, কোরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর দরবারে কবুল করে নেওয়া হয়। তাই তোমরা অতি ঘনিষ্ঠ মনে কোরবানি কর।

কোরবানি কার ওপর ওয়াজিব : যার নিকট ঈদুল আজহার দিনগুলোতে জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা বায়ান্ন তোলা রুপা বা সমমূল্যের জিনিস আছে, তার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব। সারা বছর এ পরিমাণ সম্পদ থাকার দরকার নেই। ঈদুল আজহার দিনগুলোতে থাকাও যথেষ্ট। তবে নাবালেগ ও পাগল ছেলেমেয়ের পক্ষে কোরবানি করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। আবার কেউ অন্যায় সুযোগ নিয়ে শরিয়া আইন লঙ্ঘন করে নাবালেগ ছেলেমেয়ে মালদার অর্থাৎ টাকা-পয়সাওয়ালা হলেও তার বা তাদের পক্ষে তাদের সম্পদ খরচ করে কোরবানি করা যাবে না। মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোরবানি করা যায়। কারো পক্ষে ওয়াজিব কোরবানি করতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অন্যথায় কোরবানি হবে না। কোনো উদ্দেশ্যে কোরবানির মানত করলে অবশ্যই তা করতে হবে– করা ওয়াজিব।

কোরবানি কখন করতে হয় : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত কোরবানি করা যায়।

কোন কোন পশু কোরবানি করতে হয় : গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া এবং দুম্বা দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ। অন্য কোনো পশু দ্বারা কোরবানি করা যাবে না। তবে মনে রাখা ভালো যে, ছাগল, ভেড়া, দুম্বার বয়স এক বছর, গরু-মহিষের বয়স দুই বছর এবং উট পাঁচ বছর হওয়া আবশ্যক। আর অংশীদার ভাগের ক্ষেত্রে গরু-মহিষ ও উট উর্ধ্বে ৭ জন পর্যন্ত শরিক হতে পারে। তবে শরীকদের কেউ যদি গোশত বা মাংস খাওয়ার নিয়তে অর্থাৎ আলাহর সন্তুষ্টি লাভ ব্যতীত অন্য কোনো দুনিয়াবী সুযোগ-সুবিধার যেমন, বিয়ে, জন্মদিন, উৎসবের কারণে ভাগ ভাগে কোরবানি দেওয়া হয় তাহলে সকলের কোরবানি নষ্ট হবে। অর্থাৎ কোরবানি হবে না। সুদ ঘুষ অবৈধ টাকায় কোরবানি করে লোক দেখানো সুবিধা নিলে কোরবানি হবে না।

পশুটি কেমন হবে : মোটাতাজা সুস্থ পশু দ্বারা কোরবানি করতে হবে।

কিরূপে জবেহ করতে হয় : 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে জবেহ করলে হালাল হয়। আর সেটি নিজে করতে পারলে ভালো। নিজে না পারলে অন্য কাউকে দিয়েও করানো যায়।

কোরবানির গোশত কী করতে হয় : কোরবানির গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাওয়া, এক ভাগ আত্মীয়স্বজনকে বণ্টন করা ও এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের দান করা মুস্তাহাব। তবে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর আগে কোরবানি করার জন্য অসিয়ত করে, তবে সেই কোরবানির গোশত নিজেদের খাওয়া চলবে না। সম্পূর্ণ গোশত বিলিবণ্টন করতে হবে। আরো মনে রাখা দরকার যে, কোরবানির গোশত মজুরি বা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। এটি জায়েজ না। আর একটি সুসংবাদ হলো, ঈদুল আজহার দিন সকাল থেকে কিছু না খেয়ে কোরবানির মাংস দ্বারা প্রথমে খাওয়া মুস্তাহাব।

কোরবানির চামড়া কী করতে হয় : কোরবানির চামড়া বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা গরিব-মিসকিনকে দিতে হবে। সরাসরি মসজিদে বা অন্য কোনো সৎকাজে ব্যয় করা জায়েজ নয়। এটা গরিব মানুষকে দিতে হবে।

নামাজের পর কোরবানি : পশু কোরবানি নিজে করতে পারলে ভালো। আর না করতে পারলে অন্য লোক দিয়ে করুন। অবশ্যই দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। যাতে সঠিক নিয়মে কোরবানি করা যায়। অনেক সময় দক্ষ লোকের অভাবে কোরবানির পশু হাঁটা দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। চামড়ার ক্ষতি হয়, ইত্যাদি।

আল্লাহর নাম নিয়ে কোরবানি শুরু করতে হয়। কোরবানির কাজে ব্যবহৃত ছুরি মাথাওয়ালা ও ধারালো হওয়া ভালো। সঠিক নিয়মে পশু শোয়াতে হয়। টানাহেঁচড়া যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ঈদের দিন সকালে পশুকে শক্ত খাবার দিতে হয় না। পানি বা ভাতের মাড় ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। চামড়া যাতে নষ্ট না হয় তারজন্য সল্ট ট্রিটমেন্ট বা লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ড্রাই ট্রিটমেন্ট ও ফ্রিজিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোরবানি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে রক্ত বা মাংস বা চামড়ার কোনো কিছুই পৌঁছে না। শুধু পৌঁছে তাকওয়া, পৌঁছে বিশ্বাস, পৌঁছে উদ্দেশ্য, পৌঁছে ত্যাগের মহত্ব।

লেখক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অ্যাডভোকেট

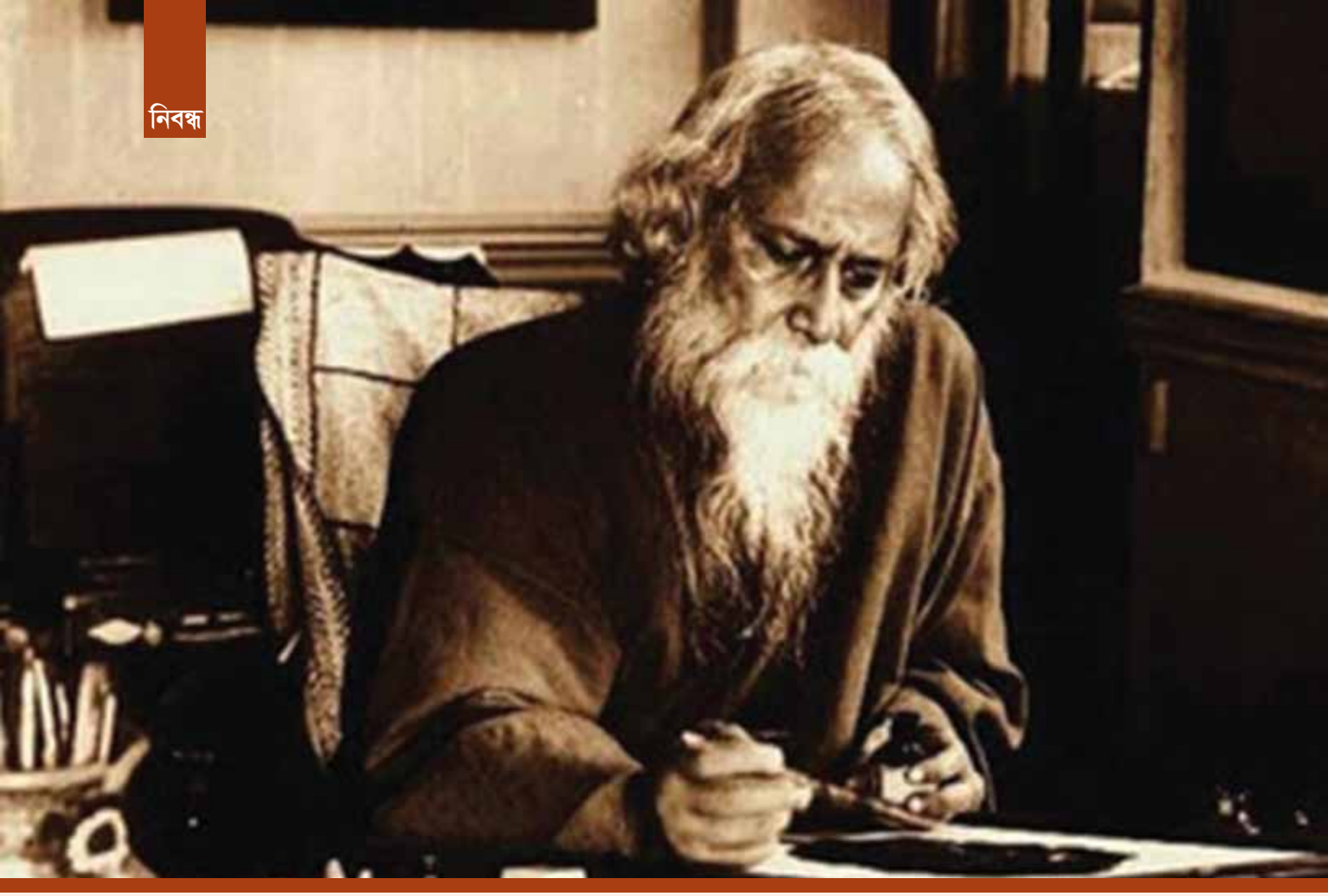

চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ

সানিয়াত রহমান

রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যেন প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক অত্যাশ্চর্য মানুষ। তিনি ভালোবেসেছিলেন প্রকৃতিকে। প্রকৃতির প্রধান উপাদান মানুষ। এই মানুষ ও প্রকৃতিকে যুগপৎ ভালোবেসেছিলেন তিনি। একসময় বিষয় ভাবনা পরিত্যাগ করার বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথের। ধীরে ধীরে তাঁর পিতা তাঁকে দায়িত্ব দিলেন জমিদারি রক্ষায়। আর রবীন্দ্রনাথের বিষয় ভাবনা পরিত্যাগ করা সম্ভব হলো না। ১৮৯০ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ জমিদারি তদারকির জন্য পূর্ব বাংলায় অভিবাসন ছিল তাঁর জীবনের মহামূল্যবান সময়। তিনি নৌকাবাস করেছেন। পদ্মা ও ইছামতি নদীতে দিনের পর দিন তিনি বিলাসবহুল বোটে কাটিয়েছেন। গভীর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন পূর্ব বাংলার মাটি ও সাধারণ মানুষকে।

দুই শতাব্দীর ধারক রবীন্দ্রনাথ বিপুল প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অহিংসা ও মানবপ্রেম তাঁর জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত। হাজার বছরের সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ। সর্বভারতীয় সংস্কৃতির একটি সুসংহত রূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে, মননে, চিন্তায় ও চেতনায় ধারণ করেছেন। এটি তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল থেকেই পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমাবেশ ঘটেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চায় দেশীয় আবহ গুরুত্ব পেয়েছে কবিতা, গান, নাটক, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে, এমনকি তাঁর চিত্রশিল্পের সবক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক শিল্প নৈপুণ্যের বৈচিত্র্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর জীবনের শেষার্ধে চিত্রশিল্পের যে পরিচয়টুকু আমরা পেয়েছি তাও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পীর চেয়ে কম নয়। তাঁর চিত্রকর্মের আলো আঁধারে ঝরনাধারায় চিত্রকল্প এবং ভাব প্রতীকীর যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তা সত্যিই বৈচিত্র্যময়। সবার ওপরে মানবীয় জীবন চরিত্রের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনা, নৈরাশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা– তার সবটাই ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্রের রেখায় রেখায়। এটি বিদগ্ধজনের দৃষ্টি কাড়তে পারে নিঃসন্দেহে। গদ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পরিচিত, চিত্রশিল্পী হিসেবে ততটা নন। তিনি গীতি ছন্দে এঁকে গেছেন তাঁর প্রতিটি স্কেচ। তবে বোদ্ধাজন তাঁর পদ্য ও গদ্যের মতো এই চিত্রশিল্প স্রোতস্বিনীর ধারায় প্রবহমান বলে মনে করেন। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি বিশেষ করে স্কেচধর্মী চিত্রশিল্পেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই চিত্রশিল্পও ছিল কাব্যময়। 'রবীন্দ্র চিত্রকলায় অরূপের অন্বেষা' নিবন্ধে পূর্ণেন্দু শেখর পত্রী যথার্থই উল্লেখ করেছেন–

> তাঁর শেষ কুড়ি বছরের সাহিত্য ও তাঁর মনের গতি বোঝার জন্য তাঁর ছবির বিশেষ মূল্য আছে। আমাদের মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। চিত্র তৈরি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা

নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। যে জগতের সত্তার বিষয়ে ইতিপূর্বে তিনি হয়ত এমন তীব্রভাবে অনুভব করেননি। ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন 'ওয়ার্ল্ড অব গেসচার' যার কাছে রবীন্দ্রনাথের মতে 'ওয়ার্ল্ড অব মিনিং' সামান্যই।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রাচীন পটভূমি থেকে তাঁর চিত্রভাবনা গ্রহণ করেছেন। ছবির জগৎ থেকে রেখার ভঙ্গী নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কবিতার জগতে– কবিতাকে করেছেন নিরাভরণ এবং অলংকার বর্জিত। আবার কবিতার জগতে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রস-সৌন্দর্যকে নিংড়ে নিয়ে ছবির জগতে তাকেই প্রকাশ করেছেন সুন্দরের প্রতি নতুন জেগে ওঠা অন্তরঙ্গ সখ্যতায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন– 'আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে 'বেশ সুন্দর হয়েছে' তখন আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবি নষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে আবার আমি উদ্ধার করি'।

গদ্য ও পদ্যের মতোই চিত্রশিল্পে আমরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা উপলব্ধি ও অনুভূতিকে বুঝতে পারি। পারিবারিক পটভূমি এক্ষেত্রে অনেকটাই কাজ করেছে। কোনোরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একইসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের দর্শন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের কালিগ্রাম থেকে জানুয়ারি ১৯৮১ সালে লিখেছেন–

'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি– ওর এই গাছপালা, নদী-মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাত আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যেসব ধন পেয়েছি– এমনকি কোন স্বর্গ থেকে তা পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা, দুধলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কা ভরা অপরিচিত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত? আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই পৃথিবী, সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে এর সুখ-দুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগারা তাদের রাখতে পারিনে। বাঁচাতে পারিনে। নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতটুকু সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি'। তাঁর এই সীমাহীন ভালোবাসা ও সহস্র আশঙ্কা 'কি দিতে পেরেছি'– এই ভাবনাই তাঁকে বিশ্বকবি ও চিন্তাকাতর এক চিত্রশিল্পীতে পরিণত করে। পূর্ব বাংলায় সরলপ্রাণ অপরিণত মানুষগুলো রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আপনার ধন', 'সোনার শস্যক্ষেত্র', 'স্নেহশালিনী নদী' কি বিস্ময়কর অনুভূতিতায় গদ্য, পদ্য এবং চিত্রশিল্পে এই বিস্ময়কর অনুভূতির প্রকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সমাজকে জাগ্রত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্য রচনা করেন। আর চিত্রশিল্প গড়েছেন নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতি নতুন মাত্রা পেয়েছে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই চিত্রশিল্পে। তাঁর চিত্রশিল্পে মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প অন্যান্য শাখার মতোই অম্লান মানবিক মূল্যবোধে ভাস্বর। বলাবাহুল্য, শুরুতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প নিয়ে সংকোচ ছিল প্রচুর। বারে বারে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন তিনি– 'আমি কি আর ছবি আঁকি। শুধু আঁচড়-মাচড় কাটি'।

প্যারিসের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি বিপুল সংবর্ধনা পায়। খ্যাতিমান কলারসিকদের দুর্লভ প্রশংসা নিজের ছবিকে 'বিশ্বের আগামী যুগের আর্ট' জানবার পরেও একবারে নিঃসংশয় হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প নিয়ে যামিনি রায় লিখেছেন– রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। তাঁর শিল্প ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্য হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হলো না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি এ দিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দময় শক্তিতে। রেখার কথা, রঙের কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই। অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। সুন্দর, অসুন্দর দৃশ্যকে তাদের যথার্থরূপে ও রেখায় প্রকাশ করায় তীব্র ও বেপরোয়া ব্যাকুলতাই রবীন্দ্র চিত্রকলায় সার্থকতা।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' সফল পররাষ্ট্রনীতির স্বীকৃতি

কৃষিবিদ শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একসূত্রে গাথা দুটি নাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই যে ৪টি বিষয় সবার আগে চলে আসে তাহলো– ক) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথা, খ) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর আগুন ঝড়ানো ঐতিহাসিক ভাষণ, গ) নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন, ঘ) আর সবশেষে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২-এ স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। তারপর ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ সাল থেকে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে ৩ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় বাংলাদেশের শক্ত অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনের সোনালি সময়। রাজনীতির শুরু থেকেই সাধারণ মানুষের ক্ষুধা নিবারণ ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার ইস্পাত-দৃঢ় স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু লালন করেছেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন এদেশের শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগণের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। আর তাই বঙ্গবন্ধু হাতে নিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলা পুনর্গঠনে ১৯৭৩-১৯৭৮ মেয়াদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। গ্রহণ করা হয়– কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। পাশাপাশি গ্রহণ করলেন উদার ও কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি এবং তার বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে মূলনীতি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। একইভাবে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও ঠিক করেছিলেন সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থেকে একে অন্যকে সহযোগিতা করার মহান ব্রত অর্থাৎ 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয় এবং সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান'।

বঙ্গবন্ধুর ভারত সফর

১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর প্রথম সরকারি বিদেশ সফর। প্রথমেই তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা প্রদানকারী পরমমিত্র প্রতিবেশী দেশ ভারত সফর করেন। সেদিন কলকাতা মহানগরীর ব্রিগেড ময়দানে ২০ লক্ষাধিক মানুষের মহাসমুদ্রে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। ভারতের রাজভবনে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন 'আপনি আমার জন্মদিন আগামী ১৭ই মার্চ ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসবেন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি চাই সেদিন আপনার সফরের আগেই আপনার সেনাবাহিনী বাংলাদেশ হতে ফিরিয়ে নিবেন'। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৭ই মার্চ ইন্দিরা গান্ধী বাংলার মাটি স্পর্শ করার আগেই ১২ই মার্চ বিদায়ী

বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব মি. রমেশ চন্দ্র, ২৩শে মে, ১৯৭৩

কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিল। শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যেই বঙ্গবন্ধুর এই দ্রুত সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর ও কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান

বঙ্গবন্ধুর সফল পররাষ্ট্রনীতির আরো একটি বড়ো উদাহরণ হচ্ছে একই বছর ১৯৭২ সালের ১লা মার্চ মুক্তিযুদ্ধের আরেক মিত্রদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতাকারী প্রস্তাবের বিপক্ষে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক অর্জন

একজন নবীন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শুরুটাই হয়েছিল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি আর কল্যাণের স্বপ্ন নিয়ে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যখন তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই আসে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও শান্তিতে অবদান রাখায় ১৯৭৩ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদ তাঁকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করে। রাষ্ট্র পরিচালনার মাত্র ১ বছর ৪ মাস ১২ দিনের মাথায় ২৩শে মে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার প্রদানের জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদ যে ঘোষণা দেয় তার অন্যতম কারণ ছিল সফল পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর শান্তির স্বপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ৪৭ বছর আগে বিশ্বশান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুর গলায় 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে'। রমেশ চন্দ্র সেদিন যে ভুল কিছু বলেননি, তার প্রমাণ পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান রেখেছিলন। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্ব, ইসলামি সহযোগিতা সংস্থায় (ওআইসি) যোগদান ইত্যাদি ছিল তাঁর বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হওয়ার প্রমাণ।

বিশেষ করে দুই পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধের সময় পুরো পৃথিবী যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিভক্ত ছিল,

তখন বঙ্গবন্ধু জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে বিশ্বশান্তি ও ন্যায়ের পথে হেঁটেছিলেন, এমনকি নির্ভয় ও দৃঢ়চিত্তে তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে'। আর এসব কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এ সম্মান পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, 'এ সম্মান কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহিদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের। জুলিও কুরি শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির'।

বিশ্বশান্তি পরিষদের শান্তি পদক প্রাপ্তি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের ও সফল পররাষ্ট্রনীতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বঙ্গবন্ধুর সফল পররাষ্ট্রনীতির আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। বিশ্বসভায় বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হন। সে সময় বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস্', 'জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন', 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা' ও 'জাতিসংঘ'। এ চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিটি সম্মেলন ও অধিবেশনগুলোতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৭৩ সালের ৩রা আগস্ট কানাডার রাজধানী অটোয়াতে ৩২টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমনওয়েলথ সম্মেলন। কিন্তু সেদিন সব নেতার মাঝে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সফল অংশগ্রহণ

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সর্বমোট ছয়জন নেতার নামে তোরণ নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে জীবিত দুই নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যজন মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটো। আলজেরিয়ায় মঞ্চে দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত– শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে'। বঙ্গবন্ধুর হিমালয়সম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আর অসাধারণ বাগ্মিতা পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছে।

বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে ইসলামিক সম্মেলনে যোগদান

১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ইসলামিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তান গমন করেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু যখন লাহোর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের জনগণ স্লোগান তুলেছে 'জিয়ে মুজিব জিয়ে মুজিব', অর্থাৎ 'মুজিব জিন্দাবাদ মুজিব জিন্দাবাদ'। শুধু তাই নয়, লাহোরে এই সম্মেলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় সেখানেও সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু এমন আত্মমর্যাদাবান নেতা ছিলেন যে, সেদিন সৌদি বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বলেছিলেন, 'ইউর ম্যাজেস্টি, আপনি আমার দেশকে স্বীকৃতি না দিয়েও আমার দেশের মানুষকে হজ্জ ব্রত পালনের সুযোগ দিয়েছেন বলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ'।

যুগোস্লাভিয়া, জাপান ও মিশর সফর

যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটো ও প্রধানমন্ত্রী জামাল বিয়েদিস বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তদ্রুপ জাপান সফরে দেশটির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা এবং মিসর সফরকালে মিসরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতও বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। জাপান সফরকালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন 'যমুনা সেতু' বর্তমানের 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নির্মাণে জাপানের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন, যা আজকে 'বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু' নামে বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান

আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য ছিল অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয়, তাহলো ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান। সেদিন জাতির পিতা জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সুগভীর দরদ ও মমত্ববোধ থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই'। তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মুহুর্মুহু করতালিতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠেছিল। অধিবেশনে সমাগত বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বিনম্র সম্বোধন জ্ঞাপন করে জাতিসংঘকে 'মানব জাতির মহান পার্লামেন্ট' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছিলেন।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শান্তি ও ন্যায়ের জন্য পৃথিবীর সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিমূর্ত হয়ে উঠবে এমন এক নয়া বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ আজ পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের সনদে যেসব মহান আদর্শ উৎকীর্ণ রয়েছে তারই জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে'।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিশ্বনেতৃবৃন্দের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হিমালয়সম উচ্চতায় আসীন ছিলেন তিনি। সেদিন অধিবেশনে আগত বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, এশিয়ার নেতা নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা'। আর তাই জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি'। বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ বিশ্বে বিরল। বঙ্গবন্ধু যেখানেই গিয়েছেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। একজন নবীন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বল্প সময়ের মধ্যে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' অর্জন বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জন্য ছিল এক বিরাট সম্মানের ও গর্বের বিষয়।

লেখক: 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক'প্রাপ্ত কৃষি সাংবাদিক, উদ্ভাবক, অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস এসসিএ (কৃষি মন্ত্রণালয়)

জীবনমুখী উন্নয়ন

ফারিহা রেজা

বাংলাদেশের রয়েছে অনেক সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার আমরাই খুলতে পারি। দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ এক অনুকরণীয় নাম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশে হতদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে হতদরিদ্র তারাই, যাদের দৈনিক আয় ১.৯০ ডলারের কম। অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকরা দাবি করছেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮.৮ শতাংশ হারে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারলে ২০৩০ সালে অতিদরিদ্রের হার ২.৯৬ শতাংশে নেমে আসবে। বাংলাদেশ ক্রমেই দারিদ্র্য জয় করছে। বাড়ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা।

উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মূলধারার সঙ্গে গণমানুষ শামিল হলেই কেবল দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাথমিকভাবে দারিদ্র্য সহনীয় মাত্রায় নেমে আসবে এবং এক পর্যায়ে বিমোচিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের মতো করে আমাদের দেশের ভাগ্যোন্নয়নের নীতিনির্ধারণ করা, জনপ্রশাসনের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত রাখা এবং দলীয় প্রভাব থেকে প্রশাসনকে মুক্ত রাখা। আমরা মনে রাখব, জনপ্রশাসন পরিচালিত হয় এদেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উপার্জিত অর্থে, শ্রমে এবং ঘামে।

বিগত বছরগুলোতে দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর উন্নয়ন কৌশল। কোনো কোনো আমদানিনির্ভর পণ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কখনো ব্যবহৃত হয়েছে ডাম্পিং কৌশল। আমাদের দেশের নির্ভরশীল উন্নয়ন পদ্ধতি ছিল শাখের করাত বা দুধারি তলোয়ারের মতো। এটি আসতেও কাটে যেতেও কাটে।

আমাদের আছে মেধা এবং হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারা; এই প্রাপ্তিটুকু অবলম্বন করে এগোনো যায় দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে। উন্নয়ন সুফলের ভাগিদার হবে সাধারণ মানুষ। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে আনার কৌশলটি প্রথমে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থনীতি অনড় নয়। বর্তমানে অর্থনীতির চলমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে। ফলে যোগাযোগ বেড়েছে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের, একের সঙ্গে বহুর, দলের সঙ্গে দলের, শ্রমিকের সঙ্গে ব্যবস্থাপকের, উৎপাদকের সঙ্গে বিপণনকারীর, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সঙ্গে পুঁজির জোগানদাতার যোগাযোগ ঘটছে প্রতিনিয়ত।

কথা হচ্ছে– উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত যে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ, তারাই পাবে উৎপাদন ভোগের অধিকার। বিষয়টি ভোগ দখলের নয়। ন্যায্য পাওনার। আজ সারা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে; যা অনেক ক্ষেত্রে গণ-স্বার্থবিরোধীও। যদিও তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বিশ্বায়নকে ঠেকানো যাবে না।

দেশ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। এটি আশার কথা। আগে যে ফসলি জমিতে ধান হতো, পাট হতো, তৈলবীজ, মুগ, মসুর, খেসারি, তিল, তিসি, সরিষা, মাসকলাই, রাধুনী ডাইন, কালোজিরা, গুয়ামুরি ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। ফসলের মৌসুমে বাড়ির উঠোন মৌ-মৌ করত ঘ্রাণে, আজ সেখানে চাষ হচ্ছে হাইব্রিড ধান। বর্তমানে বেড়েছে ধানের উৎপাদন।

দেশে সীমিত সম্পদ আছে। সেই সীমিত সম্পদকে সাধারণ জনগণের কল্যাণে সর্বাত্মক ব্যবহার করে লাগসই ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। দেশে তৃণমূল পর্যায়ে যে শক্তিবলয় রয়েছে সেগুলো আগে চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। দেশজ উন্নয়ন কৌশল সামাজিক শক্তিবলয়ের মধ্যেই রয়েছে। এক একটি অঞ্চলের চিন্তাভাবনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির কৌশল স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের তা ভালো জানা আছে। বাইরে থেকে চাপানো উন্নয়ন কৌশল তৃণমূল পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

যে-কোনো পরিবর্তন অবশ্যই পরিবেশবান্ধব, লাগসই ও টেকসই হতে হবে। সাধারণ মানুষের পছন্দ মাফিক হবে এই পরিবর্তন। সব ধরনের নিজস্ব কৌশল সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে উন্নয়নে কাজে লাগাবে। এই উন্নয়নটি হবে মানবিক। সামান্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভাগ্যোন্নয়নে চেষ্টা করে যাবার প্রণোদনাটি আগে সাধারণ মানুষের মাঝে তৈরি করতে হবে। উন্নয়ন গ্রামমুখী না হয়ে শুধু যদি শহরমুখী হয়, তবে তা ভারসাম্য উন্নয়ন হবে না। গ্রামকে বাদ দিয়ে শহরমুখী উন্নয়নের চিত্র কোনো দেশের জন্যই সুখকর নয়। সেদিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের গ্রামের উন্নয়ন সত্যি চোখে পড়ার মতো। সর্বসাধারণের শিক্ষা নিশ্চিত না হলে, প্রকৃত জীবনযাত্রার মান না বাড়লে বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। সত্যিকারের উন্নয়ন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে আনবে। যে-কোনো সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে দেবার প্রণোদনাটি প্রশাসনকে অব্যাহত রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যকার সমন্বিত যোগাযোগ। যোগাযোগটি উল্লম্ব বা VARTICAL না হয়ে আনুভূমিক বা HORIZANTAL হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেটি হবে টেকসই উন্নয়নের সহায়ক। মূলকথা গণমানুষের ক্ষমতায়ন চাই।

উন্নয়ন মাধ্যম প্রসঙ্গে আসা থাক। উন্নয়ন মাধ্যম বা ডেভেলপমেন্ট মিডিয়ার কাজ তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কণ্ঠকে মিডিয়ায় উচ্চকিত করে তোলা। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমও প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়। ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে জনগণকে সংগঠিত করে গণমাধ্যম। দেশের গণমাধ্যমগুলো সক্রিয় থাকলে সাধারণ জনগণের অনড়তা দূর হবে। গণমাধ্যম দেশের সমস্যার কথাই তুলে ধরে না, এর সমাধানের ক্ষেত্রে গণমানুষকে সংগঠিত করে। তাই বলা চলে, দেশের সাধারণ মানুষ যদি তাদের বিপর্যয় ও বঞ্চনা মোকাবিলায় গণমাধ্যমকে পাশে পায় তবে দেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।

কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০০৭ সালে ঘটে যাওয়া সিডর প্রসঙ্গ। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। আবার সিডরে প্রাণহানি ঘটেছে ১০ হাজার। মৃত্যুর ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা সচেতন মানুষকে আত্মতৃপ্ত করে না। তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের এই সময়ে ১০ হাজার লোকের মৃত্যু আমাদের তখন খুব হতাশ করেছিল। ধারাবাহিক তথ্য প্রচারের পরেও নদী ও সাগর তীরবর্তী জনগণ সচেতন হয়নি। নদীর তীরে যাদের বাস, নদীকে ঘিরে যাদের জীবন ও জীবিকানির্ভর করে। অনেকেই মনে করে 'তারিখকা বান' আসে না। অর্থাৎ তারিখ দিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে তুফান আসে না, আল্লাহ যেদিন বান দেবে সেদিনই বান বা তুফান আসবে।

যে-কোনো বিপর্যয়ে শিশু ও নারীরা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। বাড়ির বউ ঘর থেকে বের হলে ঘরের অমঙ্গল হবে, তুফানে ঘর পরে যাবে। বউ ঘরে থাকলেও ঘূর্ণিঝড়ে ঘর পরে যেতে পারে, না থাকলেও যেতে পারে– একথা অনেকেই মানতে রাজি ছিল না।

সুনামির বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশের নদী ও সাগর তীরবর্তী জনগণ রক্ষা পেয়েছিল সত্যি, কিন্তু রক্ষা পায়নি আইলা, সিডর, নার্গিস ও আম্পান থেকে। ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা বারে বারে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও সেটি 'বলার জন্য বলা, শোনার জন্য শোনা'তে পরিণত হয়েছিল। আন্তঃদপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজন যে-কোনো বিপর্যয়ে। আন্তঃদাপ্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। সিডরের বিপর্যয়ে মানুষের পাশাপাশি বৃক্ষের নিধন মনে রাখার মতো। নারকেল গাছ বা এমনি টেকসই গাছের বনায়ন হতে পারে উপকূলবর্তী এলাকায়। স্কুল, মাদ্রাসা ও মন্দির এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত, যাতে বিপর্যয়ে জনগণের আশ্রয়স্থল হতে পারে।

আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন শহরমুখী– এমন কথা বলা যাবে না। গ্রামেও উন্নয়ন ঘটছে। গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ করা যাবে, ৪০ বছর আগের গ্রাম আর এখনকার গ্রামের মধ্যে অনেক তফাৎ। সামাজিক গতিশীলতা বা সোশ্যাল মবিলাইজেশন লক্ষ করার মতো। কোনো একজন ব্যক্তি এখন খুব দ্রুত এক পদমর্যাদা থেকে অনায়াসে অন্য পদমর্যাদায় চলে যেতে পারছে। এর মূলে কাজ করছে সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রসার।

পুল-কালভার্ট নির্মাণ ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ফলে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে আজ যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে স্যানিটেশন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসঙ্গে জেন্ডার বৈষম্য কমে আসছে। গণমাধ্যম সক্রিয় থাকার ফলে গ্রামে কুশিক্ষা, ধর্মান্ধতা, যৌতুক নেওয়ার প্রবণতা কমছে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারা দেশেই নারী নির্যাতনের মাত্রা কমে এসেছে। নারীরা আজ নিজের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। নিজের পছন্দের জীবনসঙ্গী এবং কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা নির্বাচনে নারীরা অনেক দূর এগিয়েছে, যা আমাদের আশান্বিত করেছে।

যদি আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তবে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন সম্ভব।

জনস্বার্থ সংরক্ষিত হবে কীভাবে সেটা সবার আগে বিবেচ্য বিষয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের সাধারণ চাহিদা মাফিক হলো কি-না সেদিকেও নজরদারি থাকা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এদেশের সাধারণ মানুষ দ্বারা; সুতরাং প্রবৃদ্ধির ফসলও তুলবে তারাই। প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উন্নয়ন হাত ধরে এগোয়। প্রতিবছর গ্রাম থেকে রাজধানীমুখী হচ্ছে মানুষ জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে অর্থনীতির চিত্র পালটে যাবে। উল্লেখ্য, ১৯৭৪, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অনেক মানুষ রাজধানীমুখী হয়েছিল জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। গ্রাম থেকে শহরে এসে যারা হাড়ভাঙা খাঁটুনি খাটে, কখনো জীবন কাটিয়েছে মানবেতর, তারা অনেকেই কিন্তু পুঁজি সঞ্চয় করে ফিরে যেতে চায় নিজ ভিটামাটিতে। শুধু দারিদ্র্যের কারণেই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ রাজধানীমুখী হচ্ছে তা নয়। অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থানে যাবার জন্য ও ভাগ্যোন্নয়নে কেউ কেউ রাজধানীতে ভিড় জমাচ্ছে। প্রতিবছর কোন অঞ্চল থেকে কত সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ রাজধানীমুখী হচ্ছে এর সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান থাকা দরকার।

আমাদের অন্যতম আয়ের উৎস পোশাক শিল্পজাত রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। দেশের পোশাক শিল্পগুলো প্রায় সবগুলো শহরমুখী। এগুলো গ্রামমুখী করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে পোশাক শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ হলে স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং শহরের ওপর চাপ কমবে। সম্প্রতি সরকার শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করেছে শিল্পস্থাপনা গ্রামে সরিয়ে নিলে নানামুখী সহযোগিতা পাবেন তারা; এটি খুবই আশার কথা। পাশাপাশি কৃষিনির্ভর শিল্পের কথাও ভাবা যায়। মিডিয়াতে উত্তরবঙ্গের মঙ্গা নিয়ে তোলপাড় হতো প্রায় প্রতিবছর। গত কয়েক বছর উত্তরবঙ্গের মঙ্গার কথা তেমন শোনা যাচ্ছে না। খরা সহনশীল ধান উৎপাদনে দেশের অর্থনীতিতে বেশ সাড়া পড়েছে। গ্রামভিত্তিক পোশাক শিল্প কিংবা কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে উঠুক না কেন মোদ্দাকথা, বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান চাই। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি যদি প্রকৃত জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে তবে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জীবনের সোনালি অধ্যায় এমনিতেই সূচনা হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

কাজী নজরুল ইসলাম: মানবতা ও সাম্যবোধ

শ্যামল কুমার সরকার

সাহিত্য সমালোচকরা দুটি ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারাটি সাহিত্যের জন্য আর দ্বিতীয় ধারাটি সাহিত্য মানবতার জন্য। কাজী নজরুল ইসলাম নিঃসন্দেহে শেষোক্ত দলের। মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপরিসীম দায়বদ্ধতা। তাইতো দেখা যায়, একেবারে ছোটো বেলাতেই নজরুল যখন লেটোগান রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেছিলেন, তখনই তিনি চাষির গীত-এ লিখেছিলেন এসব কৃষি-পঙ্‌ক্তি–

> জীবনযাপন করিতে/চাষ কর বিধি মতে/রবে যদি সুখেতে/এ পৃথিবী মাঝার ॥/.../লাগাও ধান প্রধান ফসল/তরকারি কলাই সকল/দাও সময় মত জল/যাতে প্রাণ বাঁচে তার।/অরি হতে ফসলে/ রক্ষা কর সকলে;/নজরুল ইসলাম বলে/নইলে বাঁচা হবে ভার ॥

নজরুল চাষির ঘরে না জন্মালেও গ্রামবাংলার কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং অন্যান্য বৃত্তির মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে মিশেছিলেন বলেই এত অল্প বয়সে কৃষিগীত লিখতে পেরেছিলেন। মানব ভাবনা বালক নজরুলকে ঘিরে রেখেছিল। দেশের লোকজীবনের নানাদিক এবং জীবের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার নিদর্শন পাওয়া যায় নজরুলের 'ভগ্নস্তূপ' ও 'চড়ুই পাখির ছানা' কবিতা দুটিতে। 'ভগ্নস্তূপ' কবিতায় তিনি ভাঙা স্তূপটিকে লক্ষ করে লিখেছেন '(ওগো) কে তুমি আমার পল্লীমায়ের দুঃখের কাহিনী কহিছ'। হঠাৎ বাসা হতে শ্রেণিকক্ষে পড়ে যাওয়া একটি চড়ুই পাখির ছানার বিপন্নতা নজরুলকে এতটাই গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল যে তিনি দরদি মনে লিখলেন -

> ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে; /ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দুইটি ডানা মেলে। /বুঝতে নারি কী সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,/বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে-মায়ের সে যে বুকভরা ধন!/পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে /একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে। /মা মরেছে বহুদিন তার, ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ, /তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুন বেহাগ,/মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে, /ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।

এখানে আমরা দেখি একটি চড়ুই পাখির ছোট্ট ছানার কষ্ট দেখেই নজরুল থেমে যাননি।

তিনি যে দুখু মিয়া। তাইতো তিনি দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে ছানাটিকে উদ্ধার করে মইয়ে উঠে মায়াবী বাছাটিকে নিজ বাসায় মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এটিই নজরুলের জীবন দর্শন। সারাটি জীবন তিনি কাটিয়েছেন দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। কিন্তু নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে গেছেন নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য। বিনিময়ে নজরুল এই পৃথিবীর কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চাননি। অর্থ, যশ আর প্রতিপত্তি কিছুই তিনি চাননি। নজরুল চেয়েছিলেন সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং মানব মুক্তি। এমন ভাবনা ছিল বলেই রানিগঞ্জ সিয়ারসোল হাইস্কুলের বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ ঘটকের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষাটি না দিয়েই পালিয়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে করাচিতে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন সদ্য যুবক নজরুল। অনেকে বলতে চেষ্টা করেন নিছক অভাবের কারণেই নজরুল সেনাবাহীনিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু নজরুলের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ও বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ উপরিউক্ত অনুসিদ্ধান্ত অনায়াসেই খারিজ করে দেয়। শৈলজানন্দ বলেছেন, 'কিশোর বয়সেই নজরুল আসানসোলের একটি ক্রিশ্চান গোরস্থানে গিয়ে সেখানকার সমাধিগুলিকে ইংরেজ রাজপুরুষদের বেদি বলে কল্পনা করে বন্ধু পাঁচুর এয়ারগান দিয়ে বেদিগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি (বন্দুক) চালাতেন'। এ থেকেই বোঝা যায় পরাধীনতার তীব্র যন্ত্রণা ছোটো বয়স থেকেই নজরুলের মানসে জাগরুক ছিল এবং তীব্র ঘৃণায় তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে চেয়েছিলেন।

নজরুলের দেশপ্রেম ও গণমানুষ নিয়ে ভাবনার আরেকটি প্রামাণ্য দলিল প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। তিনি লিখেছেন, 'নজরুল বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ ঘটক ও তাঁর মাসিমার (দুকড়িবালা দেবী) অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার, পলাতক রনেন গাঙ্গুলীর ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গ্রেপ্তারে সমস্ত পরিবেশের গুরুতর পরিবর্তনের আকস্মিক আঘাতের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যোগ্য করে তোলার উম্মাদনায় স্কুলের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র হয়েও আসন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা উপেক্ষা করে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন বলেই উল্লেখ করা বোধহয় সঠিক মূল্যায়ন হবে'।

জাতীয় কবির সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

করাচিতে থাকাবস্থায় নজরুলের লেখা 'ব্যথার দান' গল্পের অন্যতম চরিত্র দারা বলেছে, 'এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি বলেই আজ মার চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালোবাসতে শিখেছি'।

একই গল্পের আরেক চরিত্র সয়ফুল-মুলক বলেছে, 'ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তি সেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে-অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসংঘের একজন'।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-তে মাঘ ১৩২৬ সংখ্যায় 'ব্যথার দান' গল্পটি প্রকাশ করার সময় বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে নজরুলের অন্যতম সুহৃদ ও পথ প্রদর্শক মুজফ্ফর আহ্মদ নজরুলের লেখা 'লাল ফৌজ' শব্দ দুটি উক্ত গল্প হতে বাদ দিয়ে 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল' বসিয়েছিলেন। মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*-য় লিখেছেন, 'ব্যথার দান প্রেমের গল্প তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে দেশপ্রেম আর আন্তর্জাতিকতার প্রচারও আমরা দেখতে পাই'।

নজরুলের অন্যতম বন্ধু জমাদার শম্ভু রায় করাচি সেনানিবাস থেকে নজরুলের আরেক বন্ধু ও জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে ২০-৬-১৯৫৭ সালে এক পত্রে লিখেন,'আমাদের ব্যারাকের কর্তৃপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি ছিল যাতে আমরা বাইরে থেকে কোনো রাজনৈতিক খবর না পাই। সেজন্য পত্রপত্রিকা যা আসত তা পরীক্ষা করে দেওয়া হতো। তা সত্ত্বেও 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো'-র মতো হওয়ার দরুন ও (নজরুল) সব খবরা-খবর কি করে জোগাড় করত, সে-ই জানে। একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে– ঐ দিন যখন সন্ধ্যার পর তাঁর (নজরুলের) ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু, তার অর্গান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে-মুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ি ছিল হুগলি শহরের ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লিতে। তিনি অর্গানে একটি মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেই দিন যে সব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই জানতে পারলাম যে, রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা ও প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লাল ফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়'।

এ থেকে উনিশ বছর বয়সি নজরুলের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র উনিশেই নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন রুশ বিপ্লব বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। আর এ নিগূঢ় কথাটি ১৯১৭ সালে বুঝতে পারা খুব সহজ ব্যাপার নয়। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি নজরুলের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই রুশ বিপ্লবের সাফল্যে তিনি ভীষণ উৎফুল্ল হয়েছিলেন। আর এ ঘটনা থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগের বশে নজরুল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন কথাটি ডাহা মিথ্যে। ১৯২০ সালে ৪৯নং বাঙালি পল্টন ভেঙে গেলে সে শিবিরভুক্ত সৈনিকদের বিভিন্ন সরকারি দফতরে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। নজরুলের বন্ধু জমাদার শম্ভু রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পান। নজরুল সাব-রেজিস্টার পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু চিরসখা মুজফ্ফর আহ্মদের পরামর্শে নজরুল সে চাকরির জন্য আর এগোননি। তিনি গণমানুষের মঙ্গলার্থে বেছে নিলেন সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অনিশ্চিত পথ। অন্যতম অভিভাবক মুজফ্ফর আহ্মদের সহচর্য খেয়ালি নজরুলকে মানুষের মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। আর এরই ধারাবাহিকতায় 'কামাল-পাশা', 'বিদ্রোহী' ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রভৃতি কবিতা, 'ম্যয় ভুখা হুঁ' ও অন্যান্য জ্বালাময়ী প্রবন্ধ, সংবাদ ও সম্পাদকীয় কলাম। নজরুল দু'হাতে লিখতে থাকেন– *মোসলেম ভারত*, *সাপ্তাহিক বিজলী*', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, *ধুমকেতু* ও সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগ* এ। উদ্দেশ্য একটিই– পরাধীন জাতির হৃদয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাসঞ্চার। একই সাথে নজরুল দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের মুক্তিকামী মানুষকে আন্তর্জাতিক ভাবনার সাথে একাত্ব করে তুলতে।

ধুমকেতু পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল লিখলেন,'স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না'। ১৯৪৭–এ দেশ বিভাগ এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সৃষ্টির পরেও নজরুলের উপরের উক্তি এতটুকু প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বরং প্রশ্ন রয়েই যায়– আমরা কি গণমানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছি ? আমরা কি নিশ্চিত করতে পেরেছি 'বিদেশির মোড়লির অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না'।

১৯২৫ সালের শেষ দিকে মাদারীপুরের নিখিলবঙ্গ ধীবর সম্মেলনের জন্য নজরুল 'ধীবরদের গান' লিখেছিলেন। এছাড়া *লাঙল* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১.১.১৯২৬) নজরুলের 'কৃষকের গান' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন'– এ 'শ্রমিকের গান', ছাত্র সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন' এ বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' লিখে নজরুল যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন

সৃষ্টি করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে *লাঙল* পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কবিতাগুলো অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে সে কবিতাগুলো রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। 'চরকার গান', 'ঝড়', 'সব্যসাচী' এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা কবিতা সংকলন 'চিত্তনামা' এবং অন্যান্য কবিতা, গান, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, অভিভাষণ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে নজরুল ক্রমাগত প্রকাশ করেছিলেন তাঁর চেতনার স্বরূপকে।

অনেকেই বলেন নজরুল মূলত প্রেমের কবি। কথাটি মোটেও ঠিক নয়। তাঁর জীবনে ব্যক্তিপ্রেমের উপস্থিতি থাকলেও মানবপ্রেমের ডাককে তিনি কখনোই প্রত্যাখ্যান করেননি। ১৯২৮ সালের পর নজরুল গানের ভুবনে চলে যান। ১৯৩০-এ প্রাণপ্রিয় পুত্র বুলবুলের অকাল মৃত্যু ও নানাবিধ আঘাতের ফলে নজরুল ভক্তিমার্গের দিকে ধাবিত হতে থাকেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং মানবিক প্রেমধর্ম নজরুলের জীবনে বরাবরই থেকে যায়। তাইতো তিনি উচ্চারণ করেন 'দাও মানবতা ভিক্ষা দাও' ও 'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'। কবির জীবনে ও সাহিত্যে সামান্যতম সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই। কারো কারো মতে নজরুল কেবলই যুগের প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছেন– কথাটি মোটেও সত্য নয়। যদি তাই হতো তবে ১৯৭১-এ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নজরুলের গান ও কবিতা শোনা যেত না। তিনি সব সময়ের বলেই যে-কোনো দুঃসহ মুহূর্তে আমরা আজও তাঁর গান গাই, কবিতা আবৃত্তি করি। 'টিকিপুর ও দাড়িস্তানের' যে কথা নজরুল অত্যন্ত দুঃখে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, সাম্প্রদায়িকতার 'ন্যাজ' টি দেখে মর্ম বেদনা অনুভব করেছেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। তাইতো নজরুলকে কবি, গীতিকার বা সুরকার অভিধায় আটকে রাখা হবে অন্যায়। তিনি একজন মানবদরদি শিল্পী। নজরুল একজন সম্পূর্ণ মানুষ। ব্যক্তিগত দুঃখ যেমন তাঁকে স্পর্শ করে, সমষ্টির দুঃখও তাঁকে বিচলিত করে। মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ছিল বলেই তিনি দেশের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিবাদী কবিতা লিখে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। জীবনব্যাপী নজরুল অশেষ যাতনা ভোগ করেছেন। তাঁর একাধিক বই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে হাত মেলাননি বলে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। তবুও একদিনের জন্যও তিনি মাথা নত করেননি। 'বল বীর/বল উন্নত মম শির'– এই ছিল তাঁর আজীবনের মন্ত্র। নজরুল হেঁটেছেন শুধুই মানবতার জমিতে। গ্রামীণ পরিবেশ, দরিদ্র দিনমজুর, ভাগচাষি ও সাধারণ প্রান্তিক মানুষই ছিলেন নজরুলের আপনজন। তাঁদের জন্যই নজরুল জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। নজরুলের ভাষায়, 'I have sacrificed everything for my country or else I could be a rich man easily'। তাইতো নজরুল আজও পরম আদর আর মমতায় বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ে। *লাঙল* পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল দেশের গরিব চাষিদের কথা, তাঁদের লড়াই সংগ্রামের কথা সারা দেশে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের প্রথমদিকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাথে তিনি কুষ্টিয়ার কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। নজরুলের গণমুখী সাহিত্য ভারত উপমহাদেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়। জীবনের সীমাহীন দুর্যোগেও নজরুল মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার মহান কর্তব্যবোধ থেকে সরে দাঁড়াননি কখনোই। তিনি মানুষের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি কোনো দিন। কলকাতায় জীবনের শেষ *অভিভাষণে* (১৯৪১) নজরুল বলেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, অনটন অভাব-অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে– এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম'।

নজরুল বেঁচে আছেন– থাকবেন। প্রতিবাদে-সমাবেশে তিনি সদা জীবন্ত। ভেদজ্ঞান ও অসাম্যের বিরুদ্ধে খাড়া-শিরদাঁড়া, জীবনের কবি, আমজনতার কবি, মানবতা ও সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মানুষের হৃদয়ের আসন থেকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা কারোর নেই।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঝিট্‌কা খাজা রহমত আলী ডিগ্রি কলেজ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ

'সিভি ব্যাংক' থেকে ২০ জন তরুণ-তরুণীর চাকরি

মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে 'আপন আলোয় আলো জ্বালো' শিরোনামে বিশেষ প্রোগাম 'সিভি ব্যাংক' উদ্‌বোধন ও অনলাইন জব ফেয়ারের আয়োজন করেছে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন এটুআই ও বিটাক। এটুআই ও বিটাক করোনা ভাইরাসের এই কঠিন সময়ে বেকার যুবক-যুবতীদের ভাগ্য বদলের পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলার শিক্ষিত বেকারদের তালিকা সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সিভি জমা দেওয়ার জন্য একটি বক্স তৈরি করা হয়েছে। এই বক্সের নাম দেওয়া হয়েছে 'সিভি ব্যাংক'। এটি স্থাপন করা হয়েছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মূল প্রবেশদ্বারে। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন থেকে ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এতে প্রচুর সাড়াও পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানার নেওয়া এ উদ্যোগের পর সিভি ব্যাংকে প্রায় ১০ হাজার সিভি জমা পড়ে। তার মধ্য থেকে চার হাজার সিভি বাছাই করে প্রাথমিকভাবে এক হাজার সিভির ডাটাবেজ করে চাকরি প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ১০ জন তরুণী ও ১০ জন তরুণের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)সহ নিয়োগদাতা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

প্রতিবেদন: আলেয়া বেগম

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান

মো. আবদুর রহমান

মধুমতি নদীর কোলঘেঁষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন 'খোকা' নামে একটি শিশু। কালক্রমে এই খোকা হয়ে ওঠেন বাংলার মহানায়ক। তিনি আর কেউ নন। তিনি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় মহান নেতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি একটি স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে। হয়ে উঠেছিলেন গণমানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এক দীপ্তিময় কালপুরুষ।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলায় ভরপুর এই বাংলাদেশ। কৃষিই ছিল এদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষির উন্নতি ছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। কৃষকরাই এদেশের প্রাণ। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দেশে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। শুরু হয় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রাথমিক হিসেবে ৩০ লক্ষ টন। সেসময় কৃষকের হাতে ছিল না আগামী ফসল আবাদ করার প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও কীটনাশক। সেচসহ কৃষি উপকরণের ঘাটতি ছিল প্রকট। এসব কেনার তহবিলও ছিল না সরকারের হাতে। ঘাটতি পূরণে বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক আমদানির মাধ্যমে এবং স্বল্পমেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে এবং কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাস জমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেন।

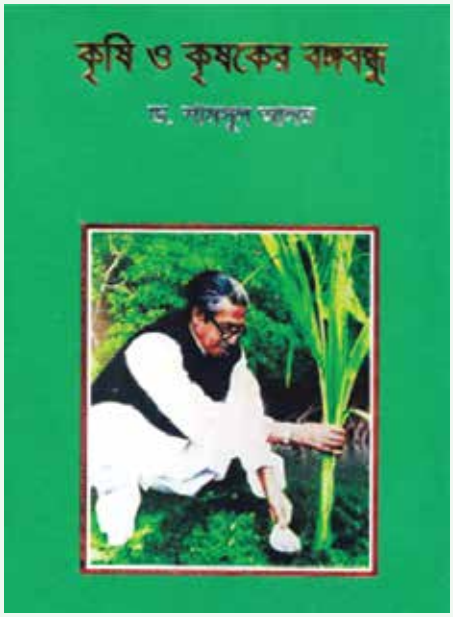

কৃষকদের উজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কোনো জাতি বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না, যদি লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভিক্ষা করতে হয়, বিদেশ থেকে আনতে হয়, দুনিয়া ঘুরে চেষ্টা করেও আমি চাউল কিনতে পারছি না। চাউল পাওয়া যায় না। চাউল যদি খেতে হয় আপনাদের পয়দা করে খেতে হবে'। বঙ্গবন্ধু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, এদেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে অন্য দেশ থেকে চাল কিনে বা খাদ্য এনে বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে জাতির পিতা বলেছেন, 'খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার' (ড. শামসুল আলম, *কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু*, জানুয়ারি ২০২০)। বঙ্গবন্ধুর এই শাশ্বত আহ্বানই কৃষি বিপ্লব ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে যুগোপযোগী ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের উজ্জীবনী বাণী ছিল উৎপাদন বাড়াও এবং কৃষকরাই হলো এই বিপ্লবের অগ্রসৈনিক। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি কৃষি বিপ্লবকে সফল করতে চেয়েছিলেন। কৃষি বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য তিনি উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণের দিকে নজর দিয়েছিলেন।

কৃষক অন্তপ্রাণ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর সহায়-সম্বলহীন ২২ লাখ কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেছেন। তাদের পুনর্বাসনে স্বল্পমূল্যে এবং অনেককে বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক ও আনুষঙ্গিক কৃষি উপকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ সুবিধা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭২ সালে বিদ্যমান সমবায় সমিতি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা চালু করে। ১৯৭২ সালের শেষে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের ৪০ হাজার শক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প, ২ হাজার ৯০০টি গভীর নলকূপ এবং ৩ হাজারটি অগভীর নলকূপ দেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে সেচের জমি এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লাখ একরে উন্নীত হয়। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কেবল ১৯৭২ সালে ৫০ হাজার টন সার, ১৬ হাজার ১২৫ টন উচ্চফলনশীল ধান বীজ, ৪৫৪ টন পাটের বীজ, এক হাজার ৭শ মণ আলু বীজ এবং তিন হাজার মণ গম বীজ বিতরণ করা হয়। এছাড়া হালচাষের জন্য নামমাত্র মূল্যে এক লাখ গবাদি পশু ও ভরতুকি মূল্যে ৫০ হাজার দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ করা হয়। অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের মণ প্রতি মূল্য নির্ধারণ করে দেন যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। সত্যিকার অর্থে বিশ্ব বাজারের এসব সারের উচ্চমূল্য যেন কৃষকদের ফসলের জমিতে সার প্রয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য সারে কৃষককে ভরতুকি দেন বঙ্গবন্ধু। এসব পদক্ষেপের ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪ শতাংশ এবং উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার ২৫ শতাংশ বেড়ে যায়। এর ফলে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে খাদ্য উৎপাদন ৮৭ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ২৩ লাখ টনে। কৃষিতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিই নয়, বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থাও বঙ্গবন্ধু করতেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৭২-১৯৭৩ সালে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ১০১ কোটি টাকা শুধুমাত্র কৃষি উন্নয়নের জন্য তিনি রেখেছিলেন (ড. মো. এনামুল হক, *কৃষি ও কৃষকের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু*, ফেব্রুয়ারি ২০১৯), যা ছিল তখনকার সময়ে এক দুঃসাহসী উদ্যোগ। এতে কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।

বঙ্গবন্ধুর আমলে শুরু হয় কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। ক্ষুধা ও

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তিনি বেশ কয়েকটি কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুনর্গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল নামক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে ধান গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন এবং ধানের ওপর নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা শুরু হয়। একইভাবে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) ও মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও পুনর্গঠন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের যদি কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা না যায়, তাহলে কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সবদিক বিবেচনা করেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সরকারি চাকরিতে অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের মতো কৃষি গ্র্যাজুয়েটদেরও প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দেন। তিনি ব্যবহারিক কৃষির ওপর জোর দিতে বলেন। তিনি আরো বলেন, 'গ্রামে যেয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে বসে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে। শতকরা ৯০ জন কৃষক গ্রামে বাস করে। গ্রামের দিকে যেতে হবে। আমার ইকোনমি যদি গণমুখী না করতে পারি এবং গ্রামের দিকে যদি না যাওয়া যায়, সমাজতন্ত্র কায়েম হবে না, কৃষি বিপ্লব হবে না'।

কৃষি শিক্ষা, মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে ভরতুকি, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, ভেঙে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন, মিল্কভিটা পুনর্গঠন– এসবের ওপর বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক জোর দিয়েছেন। কেননা তিনি জানতেন এগুলো যথাযথভাবে না করতে পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাব। বিশেষ করে সারের বিষয়ে তিনি বলেছেন, আমাদের যে সার কারখানাগুলো আছে এগুলোকে নিশ্চিত উৎপাদনমুখী করতে হবে বেশি করে। প্রয়োজনে আরো নতুন নতুন সারের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য।

তিনি গবাদি পশুর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। গরু দিয়ে হালচাষ, গরুর গোবর জমিতে প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বাড়ানোর তাগিদ তিনি তখনই দিয়েছেন। বালাই ও বালাইনাশকের কথাও তিনি বলেছেন। নিজেদের বালাইনাশক কারখানা তৈরি ও এর সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ আমদানি করে দেশের বীজের চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন করব। শীতকালীন ফসল উৎপাদনে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে যৌথ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে কৃষিতে গতিশীলতা আনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জমির খণ্ডায়ন বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন সবাই মিলে একসাথে সমবায়ের ভিত্তিতে জমিকে বিভক্ত না করে বড়ো জমিতে কৃষি কাজ করুক। এতে খরচ কমে যাবে এবং লাভ বেশি হবে।

কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সাল থেকে কৃষি উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জাতীয় কৃষি পুরস্কার' পদক চালু করেন। বঙ্গবন্ধুর সময় দেশে প্রথম কৃষিঋণ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কৃষকরা যাতে সহজভাবে ঋণ পেতে পারে এ লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করা হয়। তিনি ১০ লাখ কৃষকের কৃষিঋণের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন এবং ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাস জমি বিতরণ এবং সহজ শর্তে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং পরিবার পিছু জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে দেন। ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। দরিদ্র কৃষকদের রক্ষায় নিম্নমূল্যে রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। গরিব কৃষক পরিবারের সন্তান যেন সরকারি খরচে লেখাপড়া করতে পারে, সে ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার সরকারিভাবে খাদ্য মজুদের জন্য ১৯৭২ সালের মধ্যে ১০০ গোডাউন নির্মাণ করে। বঙ্গবন্ধু কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের স্বপ্নবীজ বুনেছিলেন। তিনি পাট, চা, পশুর চামড়া, মৎস্য ও বনজ সম্পদ ইত্যাদি রপ্তানি করে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াস নিয়েছিলেন। বস্তুত এদেশের কৃষি ও কৃষক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ছিল বিশাল। জাতির বড়োই দুর্ভাগ্য, বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও কৃষকের ভাবনা তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আরো একুশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও ভাবনাকে ভিত্তি করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে এদেশের কৃষি উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য তাঁর সরকার পরিচিতি পেয়েছে কৃষিবান্ধব সরকার হিসেবে। তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও পরিকল্পনায় দেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ যা বঙ্গবন্ধুরই চাওয়া ছিল। কৃষির নানা ক্ষেত্রে এখন অর্জিত হয়েছে অনেক সাফল্য। বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল।

লেখক : উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস রূপসা, খুলনা

দেশে ড্রোন-খেলনা বিমান ওড়াতে নিতে হবে অনুমতি

দেশের আকাশসীমায় ড্রোন, রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম এবং রিমোট কন্ট্রোলড খেলনা বিমান বিষয়ে নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) ২১শে জুলাই ২০২০ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এই নির্দেশনার কথা জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ড্রোন, রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম এবং রিমোট কন্ট্রোলড খেলনা বিমান ব্যবহার করতে চাইলে উড্ডয়নের অন্তত ৪৫ দিন আগেই বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অননুমোদিত উড্ডয়নের ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও এ ধরনের অননুমোদিত উড্ডয়ন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমতাবস্থায়, জনগণের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে ড্রোন, রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোলড খেলনা বিমান ইত্যাদি উড্ডয়নের ন্যূনতম ৪৫ দিন পূর্বে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবেদন : পি আর শ্রেয়সী শ্যামা

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগ

মোতাহার হোসেন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে বিশ্বের কোনো দেশ এখন আর একা নয়। এখন পুরো বিশ্বটাই হচ্ছে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ'। কাজেই প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা বৈশ্বিক। একই সাথে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকেই অনিশ্চিত অন্ধকারের পথে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি দেশে-বিদেশে বেকার ও কর্মহীন মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। আর বৈশ্বিক এই সংকটকালে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধিও কমে যেতে পারে। চাকরি হারাতে পারেন অনেক মানুষ। বাংলাদেশের সংকট বহুমাত্রিক হতে পারে। এমনি এক অবস্থায় প্রাণঘাতী করোনার এই বৈশ্বিক মহাদুর্যোগের কবল থেকে দেশের মানুষকে সুরক্ষা দিতে এবং মানুষের জীবন রক্ষার পাশাপাশি জীবিকার চাকা সচল রাখতে প্রায় এক লাখ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সদ্য ঘোষিত বাজেটে এই বরাদ্দ রাখা হয়। এজন্য স্বাস্থ্য সেক্টরে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে জরুরি প্রয়োজন মেটাতে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাণঘাতী করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাহসী, সময়োচিত। এখন প্রয়োজন এই বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহারের স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি নিয়ে তার সঠিক বাস্তবায়ন।

করোনা ভাইরাস আতঙ্কে একের পর এক নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্টেডিয়ামের খেলা থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো সব বৈশ্বিক আয়োজন। স্কুল, কলেজ, ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কমে আসছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞার কারণে লোকসানে পড়ছে বিশ্বের এয়ারলাইন্সগুলো। ঋণ খেলাপি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিনই ধস নামছে প্রধান সব শেয়ার বাজারগুলোতে।

জেপি মর্গান এর গবেষণা বলেছে, পরপর আগামী দুই প্রান্তিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখা দিবে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে। চলতি বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালের চেয়ে অর্ধেক কমে যাবে, জানিয়েছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সংগঠন ওইসিডি। *বন্টুমবার্গের* এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাস বিশ্ব অর্থনীতিতে দুই দশমিক সাত ট্রিলিয়ন ডলারের লোকসান ঘটাবে, যা গোটা যুক্তরাজ্যের জিডিপির সমান। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান মন্দায় পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই অভিঘাত বাংলাদেশের উপর কতটা পড়বে– এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক। তবে সরকার এজন্য আগ থেকে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে রপ্তানি আয় পড়তির দিকে। জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি কমেছে চার দশমিক সাত নয় ভাগ। অব্যাহতভাবে কমছে পোশাক রপ্তানি। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এই পণ্যটির প্রধান বাজার। করোনা ভাইরাসের কারণে সেখানকার বাজারে এর মধ্যে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ইতালিতে মানুষের জীবন এখনও স্বাভাবিক হয়নি। যেখানে ১৪৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ গত বছর। একই পরিস্থিতি গোটা ইউরোপে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির ৬২ ভাগ আসে ইউরোপ থেকে আর ১৮ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তারা এরই মধ্যে চাহিদা কমে যাওয়ার আঁচ পেতে শুরু করেছেন। কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর সভাপতি রুবানা হক বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বাজারে শতকরা তিন দশমিক এক ভাগ বিক্রি এরই মধ্যে কমে গেছে, কমে যেতে শুরু করেছে ক্রেতাদের কার্যাদেশও। এফবিসিসিআই বলেছে, 'তাদের ভয় হচ্ছে ইউরোপ নিয়ে। সেখানে যদি করোনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে পোশাকের চাহিদা অনেক কমে যাবে। মানুষ যদি ঘর থেকে বেরই না হতে পারে তাহলে পোশাক কিনবে কীভাবে? এই আশঙ্কায় পোশাক খাত, এই খাতে কমর্রত প্রায় এক কোটি শ্রমিক কর্মচারী।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশির ভাগ সূচকই নিম্নমুখী। তার মধ্যেও ভালো করছিল রেমিট্যান্স। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ১০৪২ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ ভাগ বেশি। এই গতি ধরে রাখা এখন কঠিন হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্যে। যেইসব দেশ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এরই মধ্যে কমে গেছে। সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশি শ্রমিক বা ব্যাবসায়ীরা প্রয়োজন মতো আয় করতে না পারলে দেশে পরিবারের কাছে আগের মতো

টাকা পাঠাতে পারবেন না। তাই স্বভাবতই রেমিট্যান্স কমতে থাকবে। এর প্রভাব পড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে।

করোনার প্রভাবে বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দামে ২০০৮ সালের পর সবচেয়ে বড়ো পতন হয়েছে। শুধু চলতি বছর ৫০ ভাগ কমে অপরিশোধিত ব্যারেল বিক্রি হচ্ছে ৩৩ ডলারে। এই পরিস্থিতি খুব সহসাই কাটবে এমন আভাস মিলছে না। কারণ বৈশ্বিক অর্থনীতি ধীর হলে জ্বালানির চাহিদা এমনিতেই কমতে থাকে। অন্যদিকে তেলের উৎপাদন কমিয়ে বাজার সামাল দেওয়ার বিষয়েও একমত হতে পারেনি সৌদি আরব ও রাশিয়া। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে বড়ো ধরনের লোকসান গুণতে হবে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি তেল নির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোকে। বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের বড়ো অংশটাই কিন্তু আসে এই অঞ্চল থেকেই।

অবশ্য কিছু আশা করার মতো জায়গাও রয়েছে। জ্বালানি তেলের পুরোটাই বাংলাদেশ বিশ্ব বাজার থেকে কেনে। দাম কমায় এখন আমদানি খরচ আগের চেয়ে অনেক কমে যাবে। সরকার যদি বাজারে সে অনুযায়ী দাম সমন্বয় করে তাহলে শিল্পের উৎপাদন ও পরিবহণ খরচ কমবে। এতে সাধারণ মানুষও উপকৃত হতে পারেন। তবে সরকার জ্বালানি তেলের দাম না কমালে পুরো লাভটাই ভোগ করবে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-বিপিসি।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে চীন থেকে পণ্য আমদানি বন্ধ বা কমিয়ে দিয়েছে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর ফলে পোশাক খাতে বাংলাদেশের সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হংকংভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনেও এমন তথ্য উঠে এসেছে। ২০০টি আন্তর্জাতিক ক্রেতা কোম্পানির উপর এই জরিপ চালানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে তারা চীনের বদলে এখন অন্য দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহের দিকে ঝুঁকছে। যার মধ্যে ভিয়েতনাম, ভারতের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশও। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দেশে কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কী ধরনের বা কতটুকু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, তা এখনও নির্দিষ্ট করে বলার সময় আসেনি। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থবছর শেষে এই হ্রাসের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হবে। এর ফলে অর্থবছর শেষে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিগত ৩ বছর ধরে ধারাবাহিক ৭ শতাংশের অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং সহায়ক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি। সামষ্টিক চলকসমূহের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে পারে।

এমনি এক বৈশ্বিক সংকট উত্তরণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহসী এবং মহৎ এবং বহুমাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি এই সংকট উত্তরণে খাতভিত্তিক গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রায় সাড়ে ৯৫ হাজার কোটি টাকার গুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। ইতোমধ্যে এই গুচ্ছ কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ শুরু করেছেন। আমাদের প্রত্যাশা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হবে প্রধানমন্ত্রীর এই গুচ্ছ কর্মসূচি। তাহলেই নিশ্চিত হবে সচল জীবন, সচল অর্থনীতি, সচল দেশ।

লেখক: সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

সরকার মাস্ক ব্যবহারে পরিপত্র জারি করেছে

বিশ্বজুড়ে চলছে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এসময় সরকার জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ২১শে জুলাই মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত এক পরিপত্র জারি করেছে। সকলের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পরিপত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

- সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাগণ বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসহ সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহীতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ও গীর্জাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- শপিংমল, বিপণিবিতান ও দোকানের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- হাটবাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণ মাস্ক ব্যবহার করবেন। মাস্ক পরিধান ব্যতীত ক্রেতা-বিক্রেতাগণ কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবেন না। স্থানীয় প্রশাসন ও হাটবাজার কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- গণপরিবহণের (সড়ক, নৌ, রেল, আকাশপথ) চালক, চালকের সহকারী ও যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গণপরিবহণে আরোহণের পূর্বে যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মালিক সমিতি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ সকল শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মালিকগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- হকার, রিকশা ও ভ্যানচালকসহ সকল পথচারীর মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চিত করবেন।
- হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কর্মরত ব্যক্তি এবং জনসমাবেশ চলাকালীন আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করবেন। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মালিক সমিতি নিশ্চিত করবেন।
- সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নিশ্চিত করবেন।
- বাড়িতে করোনা উপসর্গসহ কোনো রোগী থাকলে পরিবারের সুস্থ সদস্যগণ মাস্ক ব্যবহার করবেন।

প্রতিবেদন: মিঞ্জু মান্নান

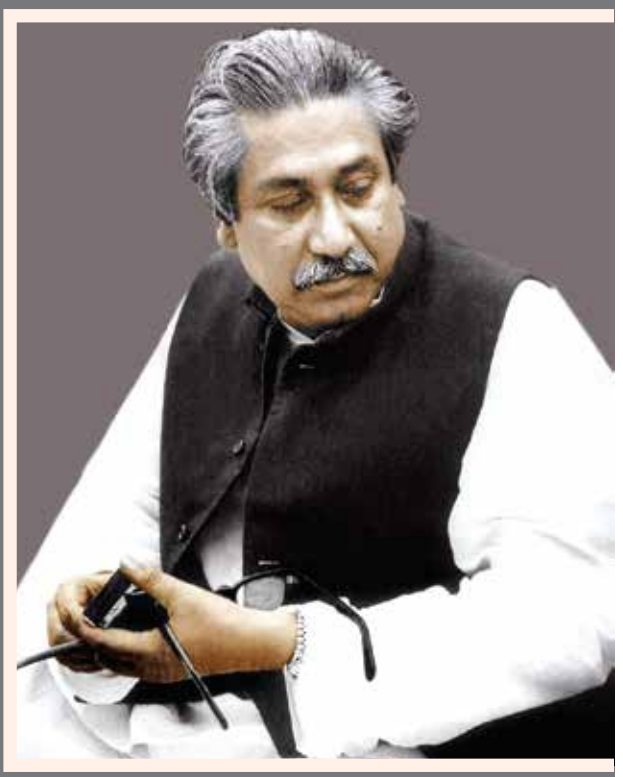

মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধুর শাহাদত নেতৃত্ব, বীরত্ব ও আদর্শে অমর

কে সি বি তপু

বাংলাদেশ ও বাঙালির সবচেয়ে বড়ো স্বপ্নভঙ্গ, হারানোর মর্মভেদী বেদনা, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী শোকের দিন ১৫ই আগস্ট– ১৯৭৫ সালের এ দিনেই কলঙ্কময় ঘটনা ঘটেছিল বাঙালির রাজনীতি, শোক ও শক্তির সূতিকাগার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক একদল সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণে এখানেই সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তীকালে এ বাড়িই 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়– যা বাংলাদেশকে স্বীয় পথে এগিয়ে যেতে নিরন্তর অনুপ্রেরণার তীর্থভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু একটি সংগ্রামী নাম, ইতিহাস স্রষ্টা একটি ইতিহাস। বিশ্বে অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও খুব অল্পসংখ্যক নেতা ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই কালজয়ী ইতিহাসের একজন অনন্য মহানায়ক। শাশ্বত বাণী– কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। বঙ্গবন্ধু শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই যেমন সত্য, তেমনি তাঁর আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব ও দৃঢ় আদর্শ এখনো আমাদের পাথেয়। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, বীরত্ব ও আদর্শ ইতিহাসে চিরভাস্বর ও চিরকালীন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ৬ দফার প্রণেতা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু নেতা হিসেবে এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নপূরণে ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে ষাটের দশক থেকেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠপুরুষ বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি 'স্বাধীন বাংলাদেশ'। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের দুর্দান্ত সংগঠক, পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রামী, ৬ দফার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের কারিগর, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী অপারেশন 'সার্চ লাইট' নামে নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে হত্যা ও বীভৎস গণহত্যা চালায়। বঙ্গবন্ধু রাত ১২.৩০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন– যার যা কিছু আছে তা নিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর ওয়্যারলেস ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরে ঐ রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাস ও পরে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের মিওয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখে। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন করে বঙ্গবন্ধু যখন স্বপ্নের মতো সাজাচ্ছেন মাতৃভূমিকে, তখন দেশি-বিদেশি চক্রান্তের ক্রীড়নক হিসেবে বিপথগামী কিছু সেনা কর্মকর্তা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে তাঁর বাসভবনে আক্রমণ চালালে প্রাণ হারান হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে এ কাপুরুষোচিত জঘন্য হামলাটি ঘটে। সপরিবারে শহিদ হন বঙ্গবন্ধু।

সেদিন বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। সে সময় শেখ হাসিনা জার্মানিতে স্বামী বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে সন্তানসহ অবস্থান করছিলেন। শেখ রেহানাও ছিলেন বড়ো বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি বিশাল। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সংগ্রামী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন তা অতুলনীয়। রাজনৈতিক নেতা ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যতটা সম্মান অর্জন করেছেন

তা বিশ্বের অনেক দেশবরেণ্য নেতাদের ভাগ্যেও জোটেনি। কিন্তু এই কৃতিত্ব অর্জন ও সংরক্ষণ করতে গিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ক্রীড়নক কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের বুলেটের সামনে পেতে দিতে হয়েছে তাঁর বিশাল বক্ষ।

বঙ্গবন্ধু আপোশহীন ছিলেন বলে নানা শ্রেণির শত্রু ছিল তাঁর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এবং এমনকি পরেও। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কতিপয় রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তা উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে এবং বাংলার স্বাধীনতাকে হত্যা করার জন্য ইতিহাসের জঘন্যতম ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। ১৫ই আগস্টের ঘটনা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণাম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বের শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে প্রকারান্তরে এদেশের স্বাধীনতাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পটভূমি ব্যাখ্যা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন। তিনি লিখেছেন–

'ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে মামলায় যেসব নথিপত্র উত্থাপন করা হয়েছে তার আলোকে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু হত্যা, জাতীয় চারনেতা হত্যা ও সংবিধান পরিবর্তন এবং সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব অপনোদন– সব একসূত্রে গাঁথা। এসব ঘটনার পেছনে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গবন্ধু যে শুধু একজন ব্যক্তি ছিলেন তাতো নয়। তিনি ছিলেন একটি নতুন আদর্শের প্রতীক। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী, তাদের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্য এটি পছন্দ করেনি। মার্কিন ডিকটাই ও চীনাদের মার্কিন ও পাকিস্তান প্রীতিকে নস্যাৎ করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি দেশ স্বাধীন করেছিল। এটি তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে সবচেয়ে বড়ো গণহত্যার বিষয়টি মার্কিন ও ইউরোপীয় বইপত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৃতিত্ব ছিল সশস্ত্রদের ওপর নিরস্ত্র বা সিভিল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যা সেই আমলের সেনা সদস্যদের পছন্দ হয়নি। তাদের ধারণা ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে। বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও বাকশাল হলে কর্তৃত্ব হারাবে। এমনিতেও তাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পাচ্ছিল। অতি বামরাও বঙ্গবন্ধুকে সরানোর জন্য ভুট্টোর সাহায্য চেয়েছিল এবং দেশেও বিপ্লবের নামে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্ত মিলে তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পটভূমি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার কারণ ছিল দুটি– এক. যেন তাঁর পরিবারের কাউকে কেন্দ্র করে আবার সেই আদর্শ উজ্জীবিত না হয়, দুই. এমন আতঙ্ক সৃষ্টি যাতে কেউ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দাঁড়াতে না পারেন। এ উদ্দেশ্য দুটির কোনোটিই সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে'। (অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন, '*সপরিবারে কেন হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুকে*', *সচিত্র বাংলাদেশ*, আগস্ট ২০১৯, পৃষ্ঠা-৮)

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় আরো বলেন, 'বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছু নাই। একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। আর তা দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি'। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, 'আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব', আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন– '১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।' তিনি ঐ ভাষণে আরো বলেন– 'জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে।' বঙ্গবন্ধুর এসব ভাষণে অসাধারণ দূরদর্শিতা ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে তাই ঘটেছিল। তিনি রক্ত দিয়েই বাঙালির ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন।

বাঙালির মানসপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু আছেন অবিনশ্বর হয়ে; চেতনার দীপ্ত প্রতীক হিসেবে। শোকাচ্ছন্ন বাঙালি এদিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। বঙ্গবন্ধু আদর্শিক চেতনা আমাদেরকে দ্বিগুণ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে।

জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে পেছনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো নানাভাবে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে কিন্তু বাঙালি জাতির হৃদয়ের আসন থেকে সরাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু অমর, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। বঙ্গবন্ধু সর্বত্রই আছেন স্বমহিমায়।

বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে যে জরিপ চালানো হয়, তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে বিবেচিত হন। জননন্দিত সংগ্রামী সেরা নেতা হিসেবে তিনি অতুলনীয়। ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক শব্দে পরিণত। বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়জুড়ে চিরঞ্জীব। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছেন। কালের চিরন্তন বেলায় তাঁর আদর্শ ও নীতি তাঁকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। বঙ্গবন্ধু অমর– তাঁর নেতৃত্ব, বীরত্ব ও আদর্শের মৃত্যু নেই। এই মৃত্যুঞ্জয়ী নেতার চেতনা বাঙালির হৃদয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনন্তকাল প্রবাহিত হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বাঙালিদেরকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। সত্যি তাই। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাঙালি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। লোকান্তরিত মুজিব অনেক বেশি শক্তিশালী– সে কথা সেই ঘৃণ্য চক্র সেদিন বুঝতে পারেনি। জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। একইসঙ্গে পনেরোই আগস্টে শাহাদতবরণকারী সবার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২০

মায়ের দুধ সন্তানের অধিকার

হামিদা খাতুন

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। তাই শিশু সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের দুধ সন্তানের অধিকার। এতে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তাই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'দ্য ওয়ার্ল্ড এলায়েন্স ফর ব্রেস্টফিডিং অ্যাকশন'-এর উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সমর্থনে ১৯৯২ সাল থেকে ১লা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত পালন করা হয় 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। ১লা আগস্ট মাতৃদুগ্ধ দিবস। বিশ্বের ১৭০টি দেশে এ সপ্তাহ পালন করা হয়। বাংলাদেশেও ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ সপ্তাহ পালনে বিশেষ উদ্যোগ এবং বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, মায়ের দুধ নবজাতকের জন্য আদর্শ পুষ্টিকর খাবার। এতে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ অনেক কমে যায়। মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটে পরিপূর্ণভাবে। মায়েদের স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে জাতি উপকৃত হয়। মাতৃদুগ্ধ পানের মধ্য দিয়ে সন্তান ও মায়ের মধ্যে তৈরি হয় এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হলে নবজাতকের মৃত্যুর হার ২২ শতাংশ কমানো সম্ভব। শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে বছরে ৩৭ হাজার নবজাতকের জীবন রক্ষা পায়। জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৪৩ শতাংশ নবজাতক জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পায়। অথচ জন্মের পর প্রথম ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৬০ হাজার নবজাতক বছরে মারা যায়। এছাড়া প্রতিবছর জন্মের পর প্রথম ২৮ দিনে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার নবজাতক মারা যায়। এই ভয়াবহ চিত্র দেখলেই বোঝা যায়, জন্মের পরপর শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া কতটা জরুরি। মায়ের দুধে খাদ্য উপাদান বিশেষ ফ্যাটি এসিড আছে, যা শিশুর বুদ্ধিদীপ্ততা ও চোখের তীক্ষ্ণতা বা জ্যোতি বাড়ায়। মায়ের দুধে প্রায় ১০০ উপাদান রয়েছে, যার প্রতিটি উপাদানই শিশুর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। গরুর দুধে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকলেও এর সবটুকু শিশুর কাজে আসে না। এছাড়া গরুর দুধে মায়ের বুকের দুধে চেয়ে ১৩ গুণ বেশি খাদ্যপ্রাণ বি-১২ থাকে, যার অধিকাংশই শিশুর জন্য অকেজো, মায়ের দুধে ৮৬ ক্যালরি শক্তি বেশি আছে। সন্তান জন্মদানের পর হদুলাভ ঘন যে দুধ বের হয় তাকে শালদুধ বা কোলাস্ট্রাম বলে। পরিমাণ কম হলেও, এটি নবজাতকের জন্য যথেষ্ট। শালদুধে অনেক বেশি রোগ প্রতিরোধ উপাদান ও শ্বেতকণিকা থাকে। এ উপাদান শিশুকে বিভিন্ন রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে। এ দুধ শিশুর অপরিণত অন্ত্রকে পরিপক্ক করে। শালদুধ শিশুর পেটের প্রথম কালো পায়খানা বা মিকোনিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে। মিকোনিয়াম পেটে বেশি থাকলে নবজাতকের জন্ডিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মায়ের দুধ খাওয়ানো অবশ্যই একটি অপরিহার্য জরুরি উদ্যোগ।

চিকিৎসকদের মতে, এই শালদুধ একজন শিশুর প্রথম ভ্যাকসিন। এই শাল দুধে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমিষ, শর্করা, স্নেহ ও ভিটামিন। এ শাল দুধ শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করে এবং শিশুর জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। যে-কোনো প্রদাহ বা ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে। জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। ডায়রিয়াজনিত পানিশূন্যতা, বিকলাঙ্গতা, শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধ করে এবং শিশুর মৃত্যু হার কমায়।

২০১৮ সালের মে মাসে ইউনিসেফ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নবজাতকের মাত্র ৫১ শতাংশকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। ৬ মাসের কম বয়সি ৫৫ শতাংশ শিশুকে কেবল বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। এ হিসাবে বিশ্বে ব্রেস্টফিডিংয়ে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। এ হার আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা

মাতৃদুগ্ধ শুধুমাত্র পুষ্টির উৎস নয়, শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই মায়ের শরীরের পক্ষেও সমান উপকারী। জন্মের প্রথম ৬ মাস শিশুকে মায়ের দুধই খাওয়ানো উচিত। তার কারণ–

- মায়ের দুধ শিশুকে পাকাশয় ও অন্ত্রের সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এই দুধ তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং এতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয় না। এছাড়া এই দুধ শিশুর পাকাশয় ও অন্ত্রের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- মাতৃদুগ্ধ শিশুর নাক ও গলার ঝিল্লির উপর আস্তরণ তৈরি করে হাঁপানি ও কানের সংক্রমণ থেকেও শিশুকে রক্ষা করে।
- গরুর দুধে অনেক শিশুর অ্যালার্জি হয়। সে তুলনায় মাতৃদুগ্ধ ১০০ শতাংশ নিরাপদ।
- সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে শিশুরা জন্ম থেকে মাতৃদুগ্ধ খেয়ে থাকে তাদের ভবিষ্যতে মোটা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ তারা খিদে অনুযায়ী খেতে শেখে। ফলে শুরু থেকেই তাদের অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা কম থাকে।
- শৈশবে লিউকোমিয়া হওয়া থেকে মায়ের দুধ রক্ষা করে। বড়ো বয়সে ডায়াবেটিস টাইপ-১ এবং উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে।
- মাতৃদুগ্ধে শিশুর বুদ্ধি বাড়ে। কারণ, প্রথমত শিশুর সঙ্গে মায়ের একটা বন্ধন তৈরি হয় এবং দ্বিতীয়ত মাতৃদুগ্ধে এমন সব ফ্যাটি এসিড থাকে যা শিশুর মগজের বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করে।
- নবজাতকদের স্তন্যপান নতুন মায়েদের তাড়াতাড়ি ওজন কমাতে সাহায্য করে।
- গর্ভাবস্থার পরে বুকের দুধ খাওয়ালে স্তনে ও ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের আশঙ্কা কম থাকে। যত দিন খাওয়ানো যায়, তত আশঙ্কা কমে।
- মায়ের দুধ খাওয়ানোর কোনো খরচ নেই। তাছাড়া শিশুর সঙ্গে মায়ের মানসিক মিলন ঘটায় এবং মায়ের শারীরিক ছোঁয়াতে শিশু আরাম বোধ করে।

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১-এর মাধ্যমে সরকার দেশকে এমন এক জায়গায় নিতে চায়, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারে। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি তিন মাসের পরিবর্তে ছয় মাসে উন্নীতকরণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল থেকে কর্মজীবী মায়েদের ভাতা প্রদান, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, বিনামূল্যে মাতৃত্ব সেবাদান ও শিশুর সুস্থ জীবনের জন্য টিকা ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে শিশুমৃত্যুর হার সংক্রান্ত এমডিজি-৪ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করার জন্য ২০১১ ও ২০১৩ সালে দুইবার সাউথ-সাউথ পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

করোনায় ঈদ-উল-আজহা সরকারের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

এস. শেফা শীলা

ঈদ-উল-আজহা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো দুটো ধর্মীয় উৎসবের দ্বিতীয়টি। এই উৎসবটি কোরবানির ঈদ নামেও পরিচিত। এর অর্থ হলো 'ত্যাগের উৎসব'। এই উৎসবের মূল বিষয় হলো ত্যাগ করা। এ দিনটিতে মুসলমানেরা ফজরের নামাজের পর ঈদগাহে গিয়ে দুই রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করে ও পরে স্ব-স্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও উট আল্লাহর নামে কোরবানি করে। ইসলামি চান্দ্র পঞ্জিকায় ঈদুল আজহা জিলহজের ১০ তারিখে পড়ে। ঈদের তারিখ স্থানীয়ভাবে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে। এবছর ১লা আগস্ট পবিত্র ঈদুল আজহা।

কিন্তু এবারের ঈদ-উল-আজহা পালিত হয় এক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে। পুরো বিশ্ব করোনা ভাইরাসে কাবু হয়ে পড়েছে। এজন্য এ বিশেষ দিনটিকে যেন মর্যাদাপূর্ণভাবে ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পালন করা যায় তার জন্য বিশেষ কিছু উদ্যোগ নেয় সরকার। সারা দেশের পশুর হাটগুলো যেন পুরো স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসে এবং কোরবানির আগে ও পরে পালনীয় সকল দায়িত্ব সম্পর্কে দেশবাসীকে অবগত করতে নেওয়া হয় নানা পদক্ষেপ।

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে স্বল্প পরিসরে, যথাসম্ভব লোক সমাগম কমিয়ে বসানো হয় কোরবানির পশুর হাট। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্বসহ অন্যান্য সরকারি নির্দেশনা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন সচেষ্ট ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি এবং দ্রুত বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকল্পে অনলাইন সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই নির্দেশ দেন। করোনার বিস্তার রোধে পশুর হাটে লোক সমাগম কমাতে কোন বিস্তীর্ণ এলাকায় পশুর হাট বসালে ভালো হবে, নাকি ছোটো ছোটো করে বিভিন্ন জায়গায় বসালে ভালো হবে সবদিক বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসন হাটের আয়োজন করে। অনলাইনে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে কোরবানির পশু কেনাবেচায় এবার ছিল সবার আগ্রহ। সরকারও পশুর হাটে না গিয়ে মানুষ যেন অনলাইনে পশু ক্রয় বিক্রয় করে তারও ব্যবস্থা করেছে এবারে। সকল খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কোরবাানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করে যা ছিল এবারের ঈদের বড়ো চমক। সরকারি উদ্যোগে গঠন করা হয় দেশের সবচেয়ে বড়ো ডিজিটাল পশু কোরবানির হাট। এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পান। একইসঙ্গে গরু চাষি, খামারি বা ব্যাপারিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ ছিল। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে টাকার বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করতে পারেন ক্রেতারা। করোনা বিস্তার রোধে সরকারের নির্দেশনা মেনে পশুর হাটে পশু বেচাকেনা করেন ক্রেতা-বিক্রেতারা ।

কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়। পশুর হাটের স্বাস্থ্যবিধি মানা, ক্রেতা-বিক্রেতা কীভাবে পশুর হাটে আসবেন, হাট কীভাবে বসবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি সচেতনতামূলক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন-টিভিসি তৈরি করা হয় যা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল । এছাড়া নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি দিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে বর্জ্য অপসারণ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন এবার।

সরকার এজন্য কোরবানি ঈদ শুরুর আগে থেকেই পশুর হাট ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে কোরবানি পর্যন্ত কীভাবে করবেন তা নিয়েও বেঁধে দেয় কিছু দিক নির্দেশনা। এবারের কোরবানির ঈদ ও এর প্রস্তুতি অন্যরকম। করোনাকালীন ঈদের প্রস্তুতিতে ডিজিটাল মাধ্যমকেই সবাই পছন্দ করেন। দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলো অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশুর হাটে উপস্থিত ছিল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের। প্রত্যেক টিমে মন্ত্রণালয়ের একজন করে উপসচিব দায়িত্ব পালন করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সারাদেশের কোরবানির পশুর হাটের জন্য ১ হাজার ২শত ১৩টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। পাশাপাশি এসকল কার্যক্রম তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিমও রয়েছে।

হাট কমিটির জন্য নির্দেশনা

- হাট বসানোর জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কোনো অবস্থায় বদ্ধ জায়গায় হাট বসানো যাবে না।
- হাট ইজারাদার কর্তৃক হাট বসানোর আগে মহামারি প্রতিরোধী সামগ্রী যেমন-মাস্ক, সাবান, জীবাণুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। পরিষ্কার পানি সরবরাহ ও হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সাবান/সাধারণ সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- পশুর হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও হাট কমিটির সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হাট কমিটির সকলের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- হাটের সাথে জড়িত সকল কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনা

দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো যেমন মাস্ক-এর সঠিক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধিসমূহ সার্বক্ষণিক মাইকে প্রচার করতে হবে।

- মাস্ক ছাড়া কোনো ক্রেতা-বিক্রেতা হাটের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। হাট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করতে পারেন বা এর মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন।
- প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডিজিটাল পর্দায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করতে হবে।
- পশুর হাটে প্রবেশের জন্য গেট (প্রবেশপথ ও বাহিরপথ) নির্দিষ্ট করতে হবে।
- পর্যাপ্ত পানি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পশুর বর্জ্য দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে। কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি করা যাবে না।
- প্রতিটি হাটে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবী মেডিকেল টিম গঠন করে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেডিকেল টিমের নিকট শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনে হাটে আসা সন্দেহজনক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে আলাদা করে রাখার জন্য প্রতিটি হাটে একটি আইসোলেশন ইউনিট (একটি আলাদা কক্ষ) রাখা যেতে পারে।
- একটি পশু থেকে আরেকটি পশু এমনভাবে রাখতে হবে যেন ক্রেতাগণ কমপক্ষে ৩ ফুট বা ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে পশু ক্রয় করতে পারেন।
- ভিড় এড়াতে মূল্য পরিশোধ ও হাসিল আদায় কাউন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- মূল্য পরিশোধের সময় সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানোর সময়কাল যেন কম হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। লাইনে ৩ ফুট বা কমপক্ষে ২ হাত দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে রেখা টেনে বা গোল চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে।
- সকল পশু একত্রে হাটে প্রবেশ না করিয়ে, হাটের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পশু প্রবেশ করাতে হবে।
- প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। অবশিষ্ট ক্রেতাগণ হাটের বাহিরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করবেন। একটি পশু ক্রয়ের জন্য ১ বা ২ জনের বেশি ক্রেতা হাটে প্রবেশ করবেন না।
- অনলাইনে পশু কেনাবেচার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সকল কাজ নিশ্চিত করতে হবে।

ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য নির্দেশনা

- ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ হাটে প্রবেশ করবেন না।
- শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থরা হাটে আসতে পারবেন না।
- পশুর হাটে প্রবেশের পূর্বে ও বাহির হবার সময় তরল সাবান/সাধারণ সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- মূল্য প্রদান এবং হাটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কমপক্ষে ৩ ফুট বা দুই হাত দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াতে হবে।
- হাট কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

পশু কোরবানিকালীন নির্দেশনা

- পশু কোরবানির সময় প্রয়োজনের অধিক লোকজন একত্রিত হবেন না এবং কোরবানির মাংস সংগ্রহের জন্য একত্রে অধিক লোক চলাফেরা করতে পারবে না।
- পশুর চামড়া দ্রুত অপসারণ করতে হবে এবং কোরবানির নির্দিষ্ট স্থানটি ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ দিয়ে ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির কাঁচা চামড়া নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মজুত এবং চামড়ায় প্রয়োজনীয় লবণ লাগানো তদারকির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি কমপ্রিহেন্সিভ মনিটরিং প্ল্যান গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় যৌথ সমন্বয় কমিটি, কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও মনিটরিং কমিটি, কন্ট্রোল রুম, ঢাকা ও নাটোর জেলার জন্য বিশেষ মনিটরিং টিম, বিভাগীয় ও জেলার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে মনিটরিং টিম এবং সকল জেলা পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে মনিটরিং টিম কাজ করেছে। বিষয়গুলো কঠোরভাবে মনিটরিং করেছে সরকার। চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর জেলা পর্যায়ে মনিটরিং করেছে। এ বছর লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার মূল্য ঢাকায় গরুর প্রতিবর্গফুট ৩৫-৪০ টাকা, ঢাকার বাইরে ২৮-৩২ টাকা, খাসির সারাদেশে ১৩-১৫ টাকা এবং বকরির সারাদেশে ১০-১২ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ট্যানারির মালিকগণ উল্লিখিত মূল্যে কাঁচা চামড়া ক্রয় করার ঘোষণা দেয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

সাইকেলের চাকা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন

ভিন্ন উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা মাথায় আসে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানা মজুমদারের। সাইকেলের চাকার গতি শক্তির মাধ্যমে চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার যন্ত্র 'ডায়নামো'-তে নতুনত্ব এনেছেন তিনি। স্বল্প খরচে উৎপন্ন এ বিদ্যুৎ থেকে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, টিভি এমনকি পানি তোলার পাম্পও চালানো সম্ভব বলে দাবি করেছেন এ উদ্ভাবক। রানা মজুমদারের জন্ম কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার সাওড়াতলীতে। অধ্যয়ন করছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে। রানা মজুমদার বলেন, সাইকেলের চাকা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার যন্ত্র আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তার উদ্ভাবন সেগুলো থেকে ভিন্ন বলে দাবি করছেন তিনি। লোডশেডিং হলে সাইকেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের মাধ্যমে একটি পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে দাবি এই তরুণের। এছাড়া যেসব এলাকায় এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেখানে এই সাইকেল ডায়নামো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। সাইকেলে ব্যায়াম করতে করতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে বলেও জানান রানা। রানার উদ্ভাবনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমরান কবির চৌধুরী বলেন, বন্ধের সময়টাতে অনেক শিক্ষার্থী যেখানে বসে থেকে দিন পার করছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী সাইকেল ডায়নামো আবিষ্কার করেছে– তা আমাদের জন্য সু-খবর। এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবসময় শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হয়।

প্রতিবেদন: মো. সীমান্ত

যুবক-যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের সাফল্য

মো. মাহমুদ হাসান

১৫ই জুলাই ছিল 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস'। ইউনেস্কো-ইউনিভোক কর্তৃক এবছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'Skills for a resilient youth'– নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যুবসমাজ দেশের মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ। 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধানতম শক্তি হচ্ছে যুবশক্তি। দেশের এই যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যুব উন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুবকদের মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও নাগরিক ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত যুবসমাজ গঠনের কার্যক্রম চলছে। যুবসমাজের উন্নয়নে সরকারের অর্জন ও সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ:

সূচক/খাত	২০০১-০৬	২০০৯-২০১৮
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ	১০, ১১,৫৭৩ জন	৫৫,০১,৫৯০ জন
আত্মকর্মসংস্থান লাভ	৪,৪৫,৩৩১ জন	২১,৩২,১৬৮ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	ছিল না	প্রশিক্ষণ: ১ লাখ ৯৩ হাজার ৯৮৫ জন, আত্মকর্মস্থান: ১লাখ ৯১ হাজার ৬৬১জন।
যুব ঋণ বিতরণ	২৫৪ কোটি ৫৮ লাখ ১৩ হাজার টাকা	১৭১৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা
নতুন প্রকল্প অনুমোদন	১১ হাজার ৯৯.৫১ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩টি	৬৯৯ কোটি টাকা ৬৪ লাখ ১৬ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২টি
যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	২ হাজার ৪৭৫টি যুব সংগঠনকে ২৪২.২৯ লাখ টাকা	১১ হাজার ৬৪১টি যুব সংগঠনকে ১,৬৬৩.১৬ লাখ টাকা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

> বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ যুবসমাজ। এ যুবসমাজকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে; তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা। সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং বেসরকারি পর্যায়েও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে বাণী প্রদান করেছেন:

বাংলাদেশ জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রতিবছর ১৫ই জুলাই বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবছরের প্রতিপাদ্য 'Skills for a resilient youth' যা সময়োপযোগী হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

> সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে প্রণীত প্রথম শিক্ষানীতিতে গণমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠী তথা যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, এ মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকীতে কেউ কর্মহীন থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন-এর অভীষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন দেশের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষ বিশেষ

করে যুবসমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। রূপকল্প ও টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও

বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ প্রকল্প

মুজিববর্ষে কেউ যাতে বেকার না থাকে, সে উপলক্ষে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' নামে একটি প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করেছে সরকার। সেখানে ২০ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে।

করোনাকালে ও পরবর্তী বাংলাদেশ নিয়ে আওয়ামী লীগের বিশেষ ওয়েবিনার 'বিয়ন্ড দ্য প্যানডেমিক'- এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠানে ৩০শে জুন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল এ কথা বলেন।

আলোচনায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'করোনার প্রভাবে সারা বিশ্বের মতো আমাদের যুব সম্প্রদায়, যারা বিভিন্ন কর্মস্থানে আছেন, তারা অনেকেই আংশিক বা পুরোপুরি বেকার হয়ে যাবেন। এই হঠাৎ বেকার হয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যারা গ্রামে চলে গেছেন বা যাবেন ভাবছেন, তাদের সেখানেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের জন্য লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। আগে লোনের ক্ষেত্রে যে ইন্টারেস্টে দিতে হতো, আমরা সেটা অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি। এ মুজিববর্ষে কেউ যাতে বেকার না থাকে, সে উপলক্ষে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' নামে একটি প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করেছি, যেখানে সর্বনিম্ন ২০ হাজার থেকে সর্বাধিক পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সারা দেশে বেকার হয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দক্ষ হিসেবে গতে তুলতে চাই। আর সে হিসেবে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। আমাদের টার্গেট রয়েছে, আগামী তিন বছরের মধ্যে ১২ লাখ দক্ষ যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা'।

প্রশিক্ষণে যুবসমাজের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার তরুণ ও যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানে বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের মূল অঙ্গীকার 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'। তারুণ্যের শক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় 'যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন' কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। এলক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতি, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও সনদায়ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বিদেশগামীদের করোনার সনদ বাধ্যতামূলক

বিদেশে যাত্রার সময় হলে করতে হবে করোনা পরীক্ষা। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ২৩শে জুলাই থেকে বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য কোভিড-১৯ পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীদেরকে সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ১২ই জুলাই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ নিয়ে বিদেশ যেতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নির্দেশনাবলি হলো– যাত্রার ৭২ ঘণ্টার পূর্বে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে রিপোর্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; নমুনা প্রদানের সময় পাসপোর্টসহ যাত্রীদের বিমান টিকেট ও পাসপোর্ট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে; কোভিড-১৯ পরীক্ষার নিমিত্তে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষাগার যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে স্থাপিত পৃথক বুথে তাদের নমুনা প্রদান করবেন; নমুনা প্রদানের পর থেকে যাত্রার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে আইসোলেশনে থাকবেন।

বিদেশ যাত্রীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা সনদ প্রাপ্তির জন্য ল্যাবে গিয়ে নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৫০০ টাকা এবং বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে ৪৫০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে। নমুনা পরীক্ষার জন্য ১৬টি সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়। হাসপাতালগুলো হলো– বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস, কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল, খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

বাংলাদেশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশ্বে দ্বিতীয়

সুস্মিতা চৌধুরী

‘মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি’– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২১-২৭শে জুলাই পর্যন্ত জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ পালিত হয়। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ২২শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে ব্যানার, ফেস্টুনসহ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ সজ্জিত করা হয়। একইসঙ্গে ঢাকাসহ সব বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যাল ও দর্শনীয় স্থানে অবস্থিত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে মৎস্য খাতে বাংলাদেশ সরকারের অবদান ও অর্জন স্ক্রল ও টিভিসি আকারে প্রচার করা হয়। মৎস্য সপ্তাহের তৃতীয় দিনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। একইদিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর ও লেকে, ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন ও ইডেন কলেজ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। মৎস্য খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ অনেক অগ্রসর হয়েছে। বিগত ১০ বছরে মাছের উৎপাদন ২৭.০১ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে বার্ষিক ৪১.৩৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন হয়েছে ৫ লাখ মেট্রিক টন। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান বর্তমানে ৩.৫৭ শতাংশ।

মৎস্য খাতে সরকারের উন্নয়নমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ২০১৯ সালে বিশ্বে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। গত বছর রেকর্ড পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয়েছে। স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ‘দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২০’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি এটি প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাদু পানির মাছ বাড়ার হারে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। ইন্দোনেশিয়ায় ১২ শতাংশ আর বাংলাদেশে এ হার ৯ শতাংশ। বাংলাদেশে কৃতিত্ব ইলিশ আর দেশি মাছ চাষে। ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম।

বিশ্বে মোট ইলিশের প্রায় ৮৫ শতাংশই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। মৎস্য খাতে সম্ভাবনা আরো বাড়বে। বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনাময় সমুদ্রসম্পদ।

এফএও’র তথ্য অনুযায়ী, গত বছর বিশ্বে প্রায় ১৮ কোটি টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এর অর্ধেকের বেশি স্বাদু পানির মাছ। বাকিটা সামুদ্রিক মাছ। ২০১৭ সালেই স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ পঞ্চম থেকে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এবারো সে অবস্থান ধরে রেখেছে। গত বছর প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছে যথাক্রমে চীন ও ভারত। চাষের মাছে বাংলাদেশের অবস্থান চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের পরে।

এতে বলা হয়েছে, করোনায় অন্যান্য খাতে কর্মী ছাঁটাই হলেও মৎস্য খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ জড়িত। আর পুকুরে মাছ চাষের কারণে গত তিন দশকে মোট উৎপাদন বেড়েছে ছয়গুণ। মাছ চাষ ও ব্যাবসায় দুই কোটির কাছাকাছি মানুষ যুক্ত আছেন। ১৯৯০ সালে মানুষ মাথাপিছু বছরে সাড়ে সাত কেজি মাছ খেত। এখন সেটা ৩০ কেজিতে পৌঁছেছে।

মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, বিশ্বজুড়ে মানুষের মাছ খাওয়া বেড়েছে ১২২ শতাংশ। বিশ্বের সাতটি দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের অর্ধেকের বেশি আসে মাছ থেকে। বাংলাদেশ প্রাণিজ আমিষের ৫৮ শতাংশ আসে মাছ থেকে। আর বিশ্বে গড়ে প্রাণিজ আমিষের ২০ শতাংশ আসে কেবল মাত্র মাছ থেকে। এদিকে গত ১০ বছরে দেশে মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ প্রায় শতভাগ বেড়েছে। ২০১০ সালের সর্বশেষ খানা জরিপে উঠে এসেছে– বছরে বাংলাদেশে একেকজন মানুষ প্রায় ১২ কেজি মাছ খায়। এখন সেটা ৩০ কেজিতে পৌঁছেছে। দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ যার এক-চতুর্থাংশ অবদান এককভাবে মৎস্য খাতের। আবার সার্বিক কৃষি খাতের গড় প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৯২ শতাংশ হলেও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের উপরে রয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) মৎস্য সম্পদের অবদান এখন ৪ শতাংশ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মৎস্য উৎপাদনে সব দিক দিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা এ খাতে আরো এগিয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে চাই। ব্যাপক মাছ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। গবেষণা করে বিজ্ঞানীদের পরামর্শে সরকার ইলিশ রক্ষায় ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। গত চার বছরে উৎপাদন প্রায় দুই লাখ টন বেড়েছে। এ খাতকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব দূর করাসহ কর্মসংস্থানের ব্যাপক কাজ হচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা বিলুপ্তপ্রায় মাছের আধুনিক চাষপদ্ধতি উদ্ভাবন করে যাচ্ছে। সামনে আমরা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে গুরুত্ব দেব।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ জানান, দেশি মাছ উৎপাদনে আমরা বিশ্বে প্রথম। আমরা নদী ও জলাশয়ে মাছের পরিমাণ এবং তার কতটুকু আহরণ করা যাবে, তা নিয়ে গবেষণা করছি। দেশের বিলুপ্তপায় মাছগুলো পুকুরে চাষের বিষয়েও কাজ করছি। ইতোমধ্যে গ্রিনহাউজ পদ্ধতি ব্যবহার করে গলদা চিংড়ি ও পাঙ্গাস মাছের আগাম ব্রড ও প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছি। আমাদের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত রুই, কাতলা, কই, তেলাপিয়া, কালবাউশ ও সরপুঁটির উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছেন। তারা দেশের বিলুপ্তপ্রায় ২২টি প্রজাতির মাছের চাষপদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮

প্রয়োজন সুষ্ঠু বাস্তবায়ন

উষা রানী রায়

বিশ্ব বিভিন্ন কালে নানারকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সর্বশেষ এসেছে বিশ্ব কাঁপানো সংক্রামক ব্যাধি কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ। জানা গেছে, করোনা ভাইরাস সাধারণত সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুকণা থেকে ছড়ায়। সচেতনতা এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কেননা, এর প্রতিরোধক টিকা বা প্রতিষেধক এখনো অনাবিষ্কৃত। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমে করোনা প্রতিরোধক টিকা ও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হবে– এই প্রত্যাশা সবারই। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ রাষ্ট্রকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম'– এই চিরন্তন বাণী প্রযোজ্য। আমাদের সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলতে হবে। এ ধরনের ভয়ংকর জীবাণুবাহী ছোঁয়াচে রোগ একেবারেই নতুন। উন্নত দেশগুলোও এ ভাইরাস মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। এটি আমাদের দেশের জন্যও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। করোনা মোকাবিলায় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ৬৬ দিন সাধারণ ছুটির পর ৩১শে মে সবকিছু সীমিত আকারে খুলে দেওয়া হয়েছে। করোনা সংক্রমণরোধে রয়েছে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি। এরপরও সারা দেশে করোনা ভাইরাসের তথ্য গোপন করে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। করোনা সংক্রমণ নিয়ে পালিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। এছাড়া করোনার লক্ষণ থাকলেও তা গোপন করে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন না অনেকেই। আবার কেউ কেউ প্রতিবেশীর কাছেও করোনার লক্ষণ গোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ কর্মস্থল থেকে পালিয়ে চলে যাচ্ছেন গ্রামের বাড়িতে। ফলে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। এ অবস্থায় 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮'-এর কঠোর প্রয়োগ জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। মূলত যে-কোনো সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে মানুষ যেন নিজে বাঁচার পাশাপাশি অন্যকে সংক্রমিত না করতে পারে সেলক্ষ্যে আইনটি করা হয়। জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা মোকাবিলা ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে এটি একটি উপযুক্ত আইন। এই আইন অমান্য করলে শাস্তির বিধানও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অনেকেরই ধারণা নেই সংক্রামক ব্যাধি আইন সম্পর্কে। আইনজ্ঞরা বলছেন, আগে জানবে তারপর মানবে। মানুষ সংক্রামক আইন সম্পর্কে জানে না। অধিকাংশ মানুষই এই আইন সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল না হওয়ায় মানার বিষয়েও জনসাধারণের মাঝে বেশি গুরুত্ব পায়নি। যদি এই আইন বিষয়ে আরো বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় তবে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এজন্য মানুষ যেন আইনটি সম্পর্কে সহজেই জানতে পারে সে বিষয়ে আরো বেশি প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতা তৈরি করা জরুরি বলে অভিমত তাদের।

২০১৮ সালে প্রণীত এ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ আইনে ২৩টি সংক্রামক ব্যাধির নাম উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আইনের ৪ ধারার 'ভ' উপাধারায় বলা হয়েছে, যেগুলোর নাম সংক্রামক ব্যাধির তালিকায় রয়েছে সেগুলোর বাইরে কোনো সংক্রামক ব্যাধি নবউদ্ভূত হলে সরকার গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সেটা এই সংক্রামক ব্যাধির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবে। এরই আলোকে ২৩শে মার্চ একটি গেজেট জারির মাধ্যমে করোনা ভাইরাসকে 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮'-এর অন্তর্ভুক্ত করে সরকার। এর ফলে দেশে সংক্রামক রোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৪।

এ আইনের অধীনে এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। এ বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সারা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বিধিনিষেধ ভঙ্গকারীদের এই আইনের অধীনেই বিচারের আওতায় আনা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এ আইন লঙ্ঘন করলে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে। ২০১৮ সালের ৬১ নং 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন-২০১৮' শীর্ষক বিশেষ আইনটি প্রণীত হওয়ায় এটি সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। তাই আইনটি সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

এ আইন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে ব্যবস্থা গ্রহণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। আইনটিতে অধিদপ্তরকে সুনির্দিষ্ট করে ১৭টি করণীয় পালনের কথা বলা হয়েছে। 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮'-এর ৫ ধারায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধিদপ্তর এ আইনের আওতায় যে-কোনো উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে যে-কোনো গণজমায়েত, পরিবহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বন্ধ ঘোষাণাসহ যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এছাড়া ৬ ধারায় একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি, ৭ ধারায় কমিটির কার্যাবলি, ৮ ধারায় কমিটির সভা সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে, ৯ ধারায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধি-বিধানের অনুসরণ, ১০ ধারায় সংক্রামক রোগের তথ্য সংগ্রহ, ১১ ধারায় সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান এবং ১২ ধারায় নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা, ১৩

ধারায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা বা ধ্বংস করার ক্ষমতা, ১৪ ধারায় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাময়িক বিচ্ছিন্নকরণের বিধান, ১৫ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরিদর্শন, ১৬ ধারায় সংক্রমিত স্থান বা স্থাপনা জীবাণুমুক্তকরণ বা বন্ধকরণ ইত্যাদি, ১৭ ধারায় স্থাপনা ধ্বংসকরণ, ১৮ ধারায় যানবাহন জীবাণুমুক্তকরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা, ১৯ ধারায় জীবাণুযুক্ত যানবাহন দ্রব্যাদি জব্দকরণ, ২০ ধারায় মৃত দেহের সৎকার, ২১ ধারায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, ২২ ধারায় আমদানি ও রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা, ২৩ ধারায় সরকারি ব্যয়ের অর্থ ফেরত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

এ আইনের ২৪, ২৫, ২৬ ধারায় শাস্তি ও দণ্ড সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ওই আইনের 'সংক্রামক রোগের বিস্তার এবং তথ্য গোপনের অপরাধ ও দণ্ড' শীর্ষক ২৪ ধারায় বলা হয়েছে, '২৪। (১) যদি কোনো ব্যক্তি সংক্রামক জীবাণুর বিস্তার ঘটান বা বিস্তার ঘটিতে সহায়তা করেন, বা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অপর কোনো ব্যক্তি সংক্রমিত ব্যক্তি বা স্থাপনার সংস্পর্শে আসিবার সময় সংক্রমণের ঝুঁকির বিষয়টি তাহার নিকট গোপন করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ'।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

'দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান ও নির্দেশ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপনের অপরাধ ও দণ্ড শীর্ষক ২৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, '২৫ (১) যদি কোনো ব্যক্তি(ক) মহাপরিচালক, সিভিল সার্জন বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার ওপর অর্পিত কোনো দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, এবং (খ) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, সিভিল সার্জন বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো নির্দেশ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ'।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদানের অপরাধ ও দণ্ড শীর্ষক ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, '২৬ (১) যদি কোনো ব্যক্তি সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ'।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাস কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ আইনের অধীনে করা অপরাধের বিচার হবে বলেও আইনে উল্লেখ রয়েছে।

এ আইনে অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হবে। ৩১ ধারায় আইনের অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি দূরীকরণ, ৩২ ধারায় আইনের উদ্দেশ্য পূরণে বিধি প্রণয়ন, গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি ও ৩৩ ধারায় তফসিল সংশোধন ইত্যাদির ক্ষমতা সরকারের রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের নির্দেশনা অনেক ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না। ভয়াবহ সংক্রমণকারী করোনা ভাইরাস আরো দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮'-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আইনে যদি কেউ সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটান বা ঘটাতে সহায়তা করেন, এ রোগ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারের দেওয়া নির্দেশনা পালন না করেন, দায়িত্ব পালন না করেন এই আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় এ আইনের বাস্তবায়ন দরকার। তবে পাশাপাশি জনগণকে আরো সচেতনও করতে হবে। আইনটি যে নিজের সুরক্ষার প্রয়োজনেই মানতে হবে– সেটা সবার আগে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে। এ আইনের বিষয়ে জনগণসহ সকল কর্তৃপক্ষ আরো সচেতন ও সজাগ হোক এবং আপামর জনসাধারণসহ সকলের সহযোগিতায় এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে করোনাসহ সকল সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে বাংলাদেশ অগ্রগামী স্থান লাভ করুক– এই প্রার্থনা করি।

লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

দেশে প্রথম
'স্মার্ট ল্যাম্পপোল' চালু

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় দেশের প্রথম স্ট্রিট ফার্নিচার 'স্মার্ট ল্যাম্পপোল' চালু করেছে সমন্বিত টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো সেবা কোম্পানি 'ইডটকো বাংলাদেশ'। স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় দেশে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক এ 'স্মার্ট সিটি ফিচার' চালু করা হলো। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম ১৩ই জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে স্মার্ট ল্যাম্পপোলের উদ্‌বোধন করেন।

টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে দেশের নাগরিকদের নির্বিঘ্ন নেটওয়ার্ক সংযোগ ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহুমুখী স্মার্ট ল্যাম্পপোল স্থাপনের এটিই প্রথম সম্মিলিত প্রয়াস। সমন্বিত এ সলিউশন বিনা মূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা, নিরাপত্তা নজরদারি (ঐচ্ছিক), আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট বিন, রিয়েল টাইম এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং প্রদান করা ছাড়াও কমিউনিটি মেসেজ প্রদানের ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল সাইনেজ' হিসেবে কাজ করবে– যা মূলত আধুনিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করবে। অনুষ্ঠানে মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকাকে 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে গড়ে তুলতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রথমবারের মতো এ ধরনের স্মার্ট সিটি সলিউশন গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক এবং বেসামরিক সেবার ক্ষেত্রে নগরবাসীকে একটি নতুন এবং উন্নত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে পেরে আমরা আনন্দিত। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষামূলক এ উদ্যোগ সফল হলে ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকা উত্তরজুড়ে আরো প্রায় ২০০-২৫০টি (আনুমানিক) জায়গাতে আমরা এ রকম স্মার্ট সলিউশন স্থাপন করব।

প্রতিবেদন: জিৎ দেব

বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালতের সূচনা

জেসিকা হোসেন

পুরো বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপে আচ্ছন্ন। স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও অফিস-আদালতের কার্যক্রম। এর মধ্যে দেশের জনজীবনে আইনশৃঙ্খলা যেন বজায় থাকে এবং এই সকল কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য দেশে শুরু হয় ভার্চুয়াল আদালত। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ২৬শে মার্চ থেকে পুরো দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটিতে আদালত বন্ধ রেখে ২৬শে এপ্রিল ভার্চুয়াল আদালত চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য সুপ্রিম কোর্টের রুলস কমিটি পুনরায় গঠন এবং ভার্চুয়াল আদালত চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রথমবারের মতো সেদিনই ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে ফুল কোর্ট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের ৮৮ জন বিচারপতি। করোনার সংক্রমণ ঠেকিয়ে আইনি প্রলম্বিত কার্যক্রম চালু করার জন্য অতঃপর ৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'আদালতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। তার দুইদিন পর ৯ই মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ অনুমোদন করে অধ্যাদেশটি জারি করে ভার্চুয়াল আদালত চালু করার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুমোদনের পর আইন মন্ত্রণালয় 'তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০'–এর গেজেট প্রকাশ করে। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির পরই করোনাকালীন সময়ে দেশের বিচারব্যবস্থায় নতুন সংযোজন হয় ভার্চুয়াল কোর্ট। স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষায় ভার্চুয়াল আদালতের প্রবর্তন সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ই-জুডিশিয়ারি প্রতিষ্ঠায় ভার্চুয়াল আদালত গঠন সরকারের সাফল্যের একটি ইতিবাচক ধাপ।

ভার্চুয়াল আদালত

স্বশরীরে উপস্থিত না থেকে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকেও ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিচার পরিচালনা করাই হচ্ছে ভার্চুয়াল আদালত। যেখানে আইনজীবী, বিচারক, আসামি, বাদী কিংবা আদালত কর্মী কেউই একসঙ্গে না বসেই শুনানি নিতে পারেন। ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রম চালানোর সুযোগ রেখে 'তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০' জারি হওয়ার পর এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

তারই আলোকে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ১০ই মে ভার্চুয়াল আদালতের 'প্র্যাকটিস ডাইরেকশন' নির্ধারণ করে দেন। ১০ই মে রেজিস্টার জেনারেল মো. আলী আকবর তিনটি আলাদা আদেশের মাধ্যমে এই প্র্যাকটিস নির্দেশনা সবাইকে জানিয়ে দেন। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে আসামি, সাক্ষী এবং আইনজীবীদের স্বশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ১১ই মে ভার্চুয়াল আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়। সেই থেকে সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশিকা 'প্র্যাকটিস ডাইরেকশন' অনুসরণ করেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ ও হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতের সকল কার্যক্রম চলতে থাকে।

৮ই জুলাই এই সংকটকালীন প্রয়োজনের তাগিদে যাত্রা শুরু করা ভার্চুয়াল আদালত 'প্রয়োজন অনুসারে' চালানোর বিধান রেখে সংসদে বিল পাস হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 'আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বিল ২০২০' সংসদে পাসের প্রস্তাব করেন। এর আগে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশের আলোকে করোনাকালে ভার্চুয়ালি আদালত পরিচালিত হয়ে আসছিল। অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করতেই বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হয়। বিলের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনের তাগিদে সীমিত পরিসরে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালিত হয় তখন থেকে। আর এ ই-জুডিশিয়াল ব্যবস্থার সুবিধাভোগীদের সংখ্যাও কম নয়।

২৬শে জুলাই সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের কারণে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারা দেশের সব অধস্তন ভার্চুয়াল আদালতে গত ৫০ কার্য দিবসে ৬৭ হাজার ২২৯ জন আসামির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১১ই মে থেকে সারা দেশে ভার্চুয়াল আদালতের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত মোট ৫০ কার্য দিবসে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩৯৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭ হাজার ২২৯ জনকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫৫ জন শিশুরও জামিন হয়েছে। আর অভিভাবকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ৭৪৬ শিশুকে।

১৯শে জুলাই থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত সারা দেশের অধস্তন আদালতে ৪ হাজার ৩১০টি মামলায় আত্মসমর্পণ আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে মোট ১১ হাজার ৭৯৬ জনের। আর ৯৩৮ জন অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ১১ই মে থেকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা পাওয়ার পর অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকশত ভার্চুয়াল আদালত চালু রয়েছে। এসব আদালতে আইনজীবীরা ই-মেইলের মাধ্যমে জামিনের দরখাস্ত দাখিল করেছেন। ৮টি বিভাগের জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিশিয়াল ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ৫০ কার্যদিবসে সারা দেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল শুনানিতে মোট ১,৩৬,৩৯৯টি জামিন-দরখাস্ত নিষ্পত্তি এবং ৬৭,২২৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর হয়েছে। জামিনপ্রাপ্তদের অধিকাংশই কারামুক্তি পেয়েছেন। যারা পাননি তাদের মুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লেখক : প্রাবন্ধিক

মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

জায়েদুল আলম

শস্য শ্যামল প্রান্তর, চারদিকে সবুজের সমারোহ, পাশেই মধুমতি নদী প্রবহমান
এমন এক বাংলাদেশ- কবিতার দেশ- সোনার দেশ- পূর্ব বাংলা।
টুঙ্গিপাড়া একটি অজোপাড়াগাঁ,
সেখানেই জন্মেছিলেন সে দিনের শিশু 'খোকা'।
মা সাহেরা খাতুনের কোলজুড়ে,
বাবা শেখ লুৎফর রহমানের পরিবারে।
যে শিশু 'খোকা' থেকে আজ বঙ্গবন্ধু
ইতিহাসের মহানায়ক– বাংলাদেশের জাতির পিতা।
শত সহস্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের দীর্ঘ সময় যাপিত যাঁর কারাগারে
'কারাগারের রোজনামচা'য় যা লিখেছেন ইতিহাসের চিরঞ্জীব এ মহামানব।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি– বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা–
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে যাঁর ঘোষণা–
সারা বিশ্বজুড়ে আজ যা বহুল আলোচিত সেই অমোঘ উচ্চারিত বাণী:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ যাঁর নেতৃত্বে সেই নেতা বন্দি পাকিস্তানের কারাগারে
যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন বাহাত্তরের জানুয়ারির দশে।
বীরদর্পে শুরু করলেন দ্বিতীয় বিপ্লবের কাজ–যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়তে,
তিন বছর প্রাণান্ত পরিশ্রম করার মাঝখানে দেশ গড়ার সংগ্রামের মহান ব্রতে।
শহিদ হলেন বিপদগামী এক দল উচ্চাভিলাষী কুচক্রী সেনা সদস্যের হাতে
উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট ভোরে নিজ গৃহে অতর্কিতে।
স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে জাতির পিতার রক্তে ভেজা মাটি হলো লাল
ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয়ী চিরকাল প্রেরণার শিখা– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

হাজার কবিতায় বঙ্গবন্ধু

মিলন সব্যসাচী

তোমার ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর– মুক্তির সংগ্রাম
স্বাধীন সার্বভৌম মাতৃভূমি, প্রিয় বাংলাদেশ
শাশ্বত স্মরণে বরণে তোমাকে করেছে মহান।
এই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মেঠোপথ প্রান্তর
পদ্মা মেঘনা যমুনা মধুমতি তুরাগ তিতাস
হাজার নদীর অববাহিকায়– সমুদ্র সৈকতে উড়ন্ত
শঙ্খচিল, শুভ্রবক আর বুনো শালিকের ঝাঁক
আজো সুমধুর সুরে গাইছে তোমার জন্মদিনের গান ।
কালজয়ী কীর্তির সমুজ্জ্বল স্মৃতি থেকে অনুরণিত হয়
অমারাত্রির আঁধার বিনাশী প্রথম আলোর স্ফুলিঙ্গ
প্রভাতের সোনারোদে নিত্যরত দোয়েলের আনন্দ।
তোমার অক্ষয় কীর্তিতে সুমধুর স্মৃতিতে মুগ্ধ হয়ে
স্বপ্নীল পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে
নিঃসৃত ঝরনাধারা অনাবিল আনন্দে ঝরে পড়ে।
জন্মশতবর্ষে আজ রূপসি বাংলার হাজার নদীর
উত্তাল তরঙ্গ, পাহাড়, পর্বত, পায়ে চলা মেঠোপথ
সুনীল আকাশ, বাউল বাতাস বিনম্র শ্রদ্ধায়–স্মরণে
তোমাকে জানায় নিবেদিত কবিতাঞ্জলি ও অভিনন্দন।
শরতের শিউলি ঝরা সবুজ ঘাসের গালিচায়
আপন আলোয় উদ্ভাসিত স্বপ্নীল আঙিনায়
টুঙ্গিপাড়ায় আতুর ঘরে মায়ের সস্নেহ- আদরে
নৈঃশব্দে গেয়ে যাও সোনার বাংলার সূচনা সংগীত
কবিকুলের শিরোমণি তুমি 'হাজার কবিতায় বঙ্গবন্ধু'।

হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু

মোঃ বাবুল মিয়া

বঙ্গবন্ধুর অমর বাণী শুনলে চোখে আসে জল,
কেমন করে মারলো ওরা বল;
ঐ ঘাতকদল?
এই বাঙালির সুখের তরে
যাঁর যৌবন গেছে কারাগারে,
ঘুরে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে;
আনল স্বাধীনতার সুফল।
মধুমতি নদীর তীরে ঘুমায় পাখি মাটির ঘরে,
আসবে কি আর বাংলায় ফিরে?
বল বাঙালি তোরা বল?
কেমন করে মারলো ওরা বল;
ঐ ঘাতকদল?
যাঁর রক্তে ভেজা বাংলার মাটি
হলো সোনার চেয়েও খাঁটি;
বাবুল বলে জোয়ার ভাটি,
আজও বহে ছল ছল।
কেমন করে মারলো ওরা বল;
ঐ ঘাতকদল?

মুজিবের ছবি রক্তে ভেজা স্মৃতির পাতায়

দেলওয়ার বিন রশিদ

মুজিবের ছবি রাখি ধরে
এই বুকে
মুজিবের ছবি আলো ছড়ায়
সুখে-দুখে।
মুজিবের ছবি সৌরভমাখা
ফুলে ফুলে
মুজিবের ছবি বটের ছায়ায়
নদীর কূলে।
মুজিবের ছবি সবুজ মাঠে
ধানের শীষে
মুজিবের ছবি আশা স্বপ্নে
আছে মিশে।
মুজিবের ছবি আছে আঁকা
খুকুর খাতায়
মুজিবের ছবি রক্তে ভেজা
স্মৃতির পাতায়।

এইতো আছি

সৈয়দ শাহরিয়ার

পাঞ্জাতনের মিছিল ধ্যানে
সবাই কি পায় মস্ত জ্ঞানে
আল্লাহ সবার যে উপাস্য
প্রকাশ গভীর সঙ্গোপনে।
এইতো আছি এইতো চলি
এই কথা সব কেন বলি
আর কতদিন থাকব হেথায়
ডাক দিয়ে যায় ভাবছি কোথায় ?

মুজিববর্ষ

মিয়াজান কবীর

কালের খেয়ায় এসেছে মুজিববর্ষ
ফুলে ফলে ফসলে হোক উৎকর্ষ।
সুজলা আর শ্যামলিমার সুষমায়
বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের মহিমায়
আমাদের মনে-প্রাণে জাগে হর্ষ।
(কালের খেয়ায় এসেছে মুজিববর্ষ)
একাত্তরে করেছি মুক্তিযুদ্ধ
আত্মত্যাগের রক্তে হয়েছি শুদ্ধ
বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের উৎস।
(কালের খেয়ায় এসেছে মুজিববর্ষ)

মুজিব মরে নাই

নজমুল হেলাল

যে জাগায় সে ঘুমায় না
যে প্রেরণা
যে শক্তি সাহস আলোকবর্তিকা
তাঁকে মৃত বলতে নেই!
যদি মৃত ভেবে অযৌক্তিক তৃপ্তি খোঁজো
অন্যায় হবে–
বীজমন্ত্র মরে গেলে মানুষের কী থাকে আর?
মুজিব মরে নাই!
অধর্ম নাশক- শোষকের কাছে ত্রাস
বৈষম্যের দেওয়াল ভেঙে ভেঙে
উন্মুক্ত আকাশ যে দেয় রঙিন করে আজও
স্বপ্নভরা হৃদয়ে সৃষ্টিশীল চঞ্চল আকাশ-
তাঁকে যারা মৃত বলতে চায়
তারা বোধ হয় ইতিহাস পড়েনি মানুষের–দাবানল থেমে গেলে
অরণ্যের জেগে ওঠা চির সবুজ দেখেনি আজও
ধ্বংসস্তূপের ভেতরে লুকিয়ে থাকা তারুণ্য
দেখা হলো না তাদের।
অবহেলা অমর্যাদা অনাদর যাঁকে দুর্বল করে না
জাতি আর জাতি'র কণ্ঠস্বর
অভিন্ন নক্ষত্র হয়ে ওঠে
দেশ দশ আর পতাকা'র বিকল্প যিনি
তাঁকে কেন মৃত বলা'র দুঃসাহস দ্যাখাও?
এখনো যে মুজিব বেঁচে আছে অন্তরে অম্লান
সে মুজিব মরে নাই
বঙ্গ ছাড়িয়ে মানববন্ধু প্রেরণা বিশ্বময়
দুর্নীতিবাজদের চোখে জীবন্ত আতঙ্ক আজও
ধর্ষক লুটেরাও জানে বিজয় মানে মুজিব
স্বাধীনতা মানে মুজিব মুক্তি মুজিবের আরেক নাম
মুক্তিবাহিনী
মুক্তিযোদ্ধার এক একটি লাল গোলাপ প্রতিবাদের মশাল
যেন মুজিব ছাড়া আর কিছু নয়
আজও অহঙ্কার আমাদের কোটি কোটি জনতার!
মুজিব রাঙা ফুল সুবাসিত
মুজিব মর্মমূল চেতনার
ভাষা আশাতে দেশপ্রেম মানুষে মানুষে ভলোবাসাতে
বাতিঘর জাতিস্বর মুজিব
এখনো স্বপ্ন দেখায়
অমর কবিতা লেখায় মুজিব আমাদের
মৃত বলো না তাঁকে মুজিব মরে নাই
মুজিব চেতনায়!

বঙ্গবন্ধু

গোলাম নবী পান্না

দেশ ও জাতির টানে নেতার
কাঁদে যখন মন
দৃঢ়-প্রত্যয় নিয়ে খোঁজেন
শান্তি সারাক্ষণ।
এমনি কি আর আসে সে ক্ষণ
চাওয়া থেকে পাওয়া?
জীবনবাজি রেখে তখন
লড়াই করে যাওয়া।
তেমনি লড়াই করে গেছেন
দেশ সেবারই কাজে
দেশবাসী তাঁর মিল খুঁজে পায়
কাজ ও কথার মাঝে।
সেই সে নেতা একজনই হন
'বঙ্গবন্ধু' তিনি
দেশের মানুষ তাঁর কাছে তাই
চিরদিনই ঋণী।

বঙ্গবন্ধু

দেলোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু সকালবেলা সোনা আলোর রবি
বঙ্গবন্ধু সবার নেতা দেশের বড়ো কবি।
বঙ্গবন্ধু হাজার ফুলে গাঁথা একটি মালা,
স্বাধীনতা এনে দিলেন জুড়ালো সব জ্বালা।
বঙ্গবন্ধু খোদার দেওয়া একটি নতুন তারা,
বাংলা স্বাধীন হতো কি আর সেই তারাটি ছাড়া?
বঙ্গবন্ধু শান্ত সকাল আলো ভরা আকাশ,
হাজার ফুলের গন্ধমাখা ঝিরি-ঝিরি বাতাস।
বঙ্গবন্ধু দোয়েল- শ্যামা সবুজ বনের পাখি,
সেই পাখিটা আদর মেখে বুকের খাঁচায় রাখি।

জাতির পিতার জন্য কান্না

শাহনাজ

পিতার আহাজারি আজও কানে বাজে
'হায়! আমার বঙ্গবন্ধুকে ওরা মেরে ফেলেছে!'
প্রকাশ্যে যে মানুষটি কোনোদিন কাঁদেননি, সেই
আমার পিতার আচরণে, জীবন বোধে, উচ্ছ্বাসে
সেদিনের সেই প্রভাতে কোনো পরিমিতি বোধ
ছিল না। অশ্রুভেজা কণ্ঠে তিনি বুকচাপড়ে
কপালে হাত রেখে শুধু আহাজারি করেছেন
হায় বঙ্গবন্ধু! আজ না হোক এদেশ
একদিন ঠিকই তোমাকে চিনে নিবে
হে স্বাধীনতার স্থপতি।

ডিজিটাল কেনাকাটা

মো. এনামুল হক

আমরা যেভাবে গতানুগতিক ধারায় সশরীরে স্টোর বা দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করে আসছিলাম, তা বদলে যাচ্ছে ডিজিটাল

প্রযুক্তির মাধ্যমে। পরিবর্তন ঘটছে পণ্য-সেবার দাম পরিশোধের প্রক্রিয়ায়ও। কোভিড-১৯ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধরনই পালটে দিয়েছে। যে কারণে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভোক্তারা মুদি পণ্য থেকে শুরু করে সিনেমার ডিভিডি–সব কিছুই প্রযুক্তিভিত্তিক উপায়ে অর্থাৎ অনলাইনে কেনার প্রতি দ্রুত ঝুঁকে পড়েছেন।

বিভিন্ন ধরনের কার্ড এনে দিয়েছে আনন্দময় কেনাকাটার এই সুবিধা। এর পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং ও কিউআর কোডনির্ভর কেনাকাটা তো রয়েছেই। ডিজিটাল সেবানির্ভর এ ধরনের কেনাকাটায় ভোক্তারা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, তেমনি তাদের অধিক হারে আকৃষ্ট করতে বিক্রেতারাও দিচ্ছে নানা রকমের ছাড়। দেশীয় ব্র্যান্ড আড়ং, ইয়েলো, লারিভ, ক্যাটস আই, অঞ্জন'স, সেইলরসহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস এখন অনলাইনেও পণ্য বিক্রি করছে। তাদের অনলাইনে পোশাক বিক্রির টাকা কার্ডে বা মুঠোফোনের মাধ্যমে পরিশোধ করেন ক্রেতারা। আবার দারাজ, আজকের ডিল, ইভ্যালি, বাগডুমসহ অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতেও ঈদকেন্দ্রিক কেনাকাটা অনেক বেড়েছে। এসব প্ল্যাটফর্মে নগদের চেয়ে কার্ডে বা মুঠোফোনে বেশি অর্থ পরিশোধ হচ্ছে। ফলে বলা যায়, কেনাবেচায় অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে ডিজিটাল মাধ্যমগুলো।

প্রতিবছরের মতো এবারো ঈদের কেনাকাটায় বিশেষ সুযোগ দিয়েছে ব্যাংকগুলো। তবে তা সবার জন্য নয়, যারা ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করেন, তারাই কেবল কেনাকাটায় বিশেষ ছাড় পেয়েছেন। এখন বাংলাদেশে উৎসব ঘিরে পণ্যের দামে বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়ের আয়োজনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ব্যাংকগুলোর ইস্যু করা কার্ড। বাংলাদেশে কেনাকাটা বা লেনদেনে নগদ অর্থের পরিবর্তে কার্ডের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। আর কার্ডে কেনাকাটায় পণ্যের দাম কমাতে সহযোগিতা করছে ব্যাংকগুলো। জানা গেছে, বিভিন্ন ব্যাংকের কার্ডধারীদের জন্য নির্দিষ্ট শোরুম থেকে কেনাকাটার বিপরীতে ১০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো নতুন গ্রাহক আকর্ষণের পাশাপাশি পুরোনো গ্রাহকদের 'ঈদ উপহার' দিচ্ছে। এদিকে ডিজিটাল কেনাকাটার বড়ো অংশ এখন রয়েছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নিয়ন্ত্রণে। বিশেষ করে বিকাশ ও রকেটের মাধ্যমে। বিকাশের গ্রাহকেরা সারা দেশের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে ২০ শতাংশ পর্যন্ত এবং কিছু হাউসে কেনাকাটায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পেয়ে থাকেন।

ঘরে বসেই কেনাকাটার উপায় করে দিয়েছে অনলাইন শপিংসাইটগুলো। যানজট ঠেলে বাজারে না গেলেও চলবে। শুধু থাকতে হবে ইন্টারনেট সংযোগ। ডিজিটাল যুগে কষ্ট কমিয়ে দিচ্ছে অনলাইন শপিংসাইটগুলো। পিছিয়ে নেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেইসবুক। কম্পিউটারে ব্রাউজ করলেই ঘরে বসে পাওয়া যাচ্ছে নিজের পছন্দমতো পোশাক, গহনা বা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। অনলাইন শপিং শুনলেই অনেকে মনে করেন, টাকা দিতে হবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে। তবে সেই সমস্যাও এখন বলতে গেলে নেই। বেশিরভাগ অনলাইন শপই 'ক্যাশ অন ডেলিভারি' সার্ভিস দিয়ে থাকে। জামাকাপড়, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, ডে ক্রিম, নাইট ক্রিম, শাওয়ার জেল, মেনজ আইটেম এমন অসংখ্য প্রোডাক্ট দিয়ে সাজানো এই অনলাইন দোকানগুলোতে রয়েছে নিজস্ব ডেলিভারি ম্যান, যারা অর্ডার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাহকের হাতে পণ্য পৌঁছে দেয়।

বইপ্রেমীদের কাছে ঘরে বসে বই কেনার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে rokomari.com। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ৮৬ হাজার বইয়ের সম্ভার নিয়ে সাজানো হয়েছে এই অনলাইন বইয়ের দোকান। সাইটে নেই, এমন কোনো বইয়ের অর্ডার করা হলেও সেটি বাইরে থেকে এনে দেয় তারা। এক্ষেত্রে বইয়ের দাম পড়বে কিছুটা বেশি।

এমনই আরও অনেক সাইটের মধ্যে আছে aponzone.com, kudoro.com, wristbands-house.com, AmarGadget.com, feriola.com, banglashoppers.com, akhoni.com, goponjinish.com, biponee.com, priyoshop.com, dam.com.bd, bdebazaar.com, ajkerdeal.com ইত্যাদি। শুধু মাছ কেনাকাটার জন্য রয়েছে fish.com.bd। দেশি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন পোশাক কেনার জন্য রয়েছে bangladeshbrands.com।

রঙ, এক্সট্যাসি, সাদা-কালো, মেন্‌জক্লাব, প্রবর্তনা, নগরদোলাসহ ৩৯টি ব্র্যান্ডের ২১ হাজারেরও বেশি রকমের কাপড় রয়েছে। আরো আছে ১০ হাজারেরও বেশি বই, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য। এখন থেকে ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড, ব্র্যাক ব্যাংকের কার্ড, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস কার্ড, কিউ-ক্যাশ কার্ড অথবা আপনার যে-কোনো ব্যাংকের একটি এটিএম কার্ড অথবা বিকাশ-এর মাধ্যমে কেনা যাবে। দেশের সুপার শপ মিনা বাজারও গ্রাহকদের অনলাইন সার্ভিস চালু করেছে। meenabazar.com.bd থেকে মিনা বাজারের যাবতীয় পণ্য কেনা যাবে।

অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেইসবুক। প্রায় তিন বছর ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অনলাইন শপিংয়ের ফ্যান পেইজগুলো। ফেইসবুকে পেইজ তৈরি করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাতে দেশি-বিদেশি নানান ধরনের পণ্য বিক্রি করছেন। ফেইসবুকভিত্তিক অনলাইন পেইজগুলো বেশিরভাগই বিদেশি জুয়েলারির জন্য জনপ্রিয়। তাছাড়া দেশীয় বাজারে সহজলভ্য নয় এমন 'এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট' কেনার জন্যও

দারুণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেইসবুক পেইজগুলো। বিক্রেতার সঙ্গে ফেইসবুক পেইজে বা ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। কোনো পণ্য না থাকলেও ফেইসবুকের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তা আনিয়ে দেয়।

অনেক পোশাক নকশাকার তাদের নকশা করা পোশাক বিক্রির জন্য বেছে নিয়েছেন ফেইসবুক। আবার দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পোশাকের রেপ্লিকাও তৈরি করে দিচ্ছেন অনেকে। তবে ফেইসবুকে কেনাকাটা করার সময় বা আগে, যে পেইজ থেকে কিনতে যাচ্ছেন বা অর্ডার করছেন সেই পেইজ এবং এর কর্ণধার সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেওয়া ভালো। কারণ অনেক সময়ই 'ফেইক পেইজে'র পাল্লায় পড়ে ভুগতে হয়েছে অনেককেই।

ডিজিটাল যুগে কেনাকাটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হলেও ঘরে আসছে আসল পণ্য। ফলে করতে হচ্ছে না খাটনি, বেঁচে যাচ্ছে সময়। ভার্চুয়াল পশুর হাট একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। যেখানে অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোরবানির পশুর ক্রেতা ও বিক্রেতারা একসঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বিক্রেতা গরু, ছাগল বা কোরবানির উপযুক্ত পশুর স্থিরচিত্র বা ভিডিও দেখান। গরুর দাম, বয়স, ওজন, কয়টা দাঁত রয়েছে, কোথা থেকে আনা হয়েছে, এমন সব তথ্য রয়েছে। কোরবানির হাটে গিয়ে ক্রেতা যেভাবে গরু যাচাই-বাছাই করে থাকেন, ঠিক সেভাবেই দেখা যাবে। পছন্দ হলে ক্রেতা গরু কিনে নিতে পারছেন। দাম ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে পরিশোধ করা যায়। ক্রেতা যেখানে চাইবেন, সেখানেই গরু পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রযুক্তির সাথে সাথে বাইরের দেশগুলোর মতো আমাদের দেশের অনলাইন কেনাকাটার ট্রেন্ড অনেক বেড়েছে। আমাদের মাঝে এখন অনেকেই অনলাইনে কেনাকাটায় প্রাধান্য দেই । করোনা মহামারির পরেও ভোক্তাদের ডিজিটাল উপায়ে কেনাকাটার এই অভ্যস্ততা স্থায়ী রূপ পেয়ে যেতে পারে। মাস্টারকার্ডের এক গবেষণায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। মাস্টারকার্ডের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রোডাক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন) সন্দীপ মালহোত্রা বলেন, 'মানুষ নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে এখন প্রযুক্তিভিত্তিক লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ফুড ডেলিভারি ও মুদি পণ্য কেনা থেকে শুরু করে টেলিমেডিসিন, কনফারেন্স আয়োজন, ফিটনেস কোর্স, লার্নিং এবং বিনোদন সব পণ্য-সেবাই নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী ঘরে বসেই পেতে চান। মানুষের এই চাহিদা ও প্রত্যাশা কোভিড-১৯ শেষ হওয়ার অনেক পরেও অব্যাহত থাকবে এবং তা অনলাইন বা ই-কমার্সের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ঝোঁক ও প্রবণতা জোরালো হবে।' ডিজিটাল কমার্স বা প্রযুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যকে বেছে নিচ্ছেন এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভোক্তারা। পুরোনো পদ্ধতিতে কেনাকাটায় ভোক্তার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ৭৯ শতাংশ এবং এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৯১ শতাংশ ভোক্তা ডিজিটাল উপায়ে পণ্যসেবা কিনে থাকেন। প্রতি ১০ জনে ৬ জন ভোক্তাই স্থায়ীভাবে অনলাইনভিত্তিক লেনদেন করতে চান। তারা মনে করেন, করোনার পর পুরোনো পদ্ধতির লেনদেনের জায়গাটি নিয়ে নেবে অনলাইনভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম। সম্প্রতি মাস্টারকার্ডের এক গবেষণা জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২৭শে এপ্রিল থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত এই জরিপ পরিচালনা করে মাস্টারকার্ড।

লেখক: প্রাবন্ধিক

মশক নিধনে প্রয়োজন সমন্বয়

আরীয়ান খান

মশা আকৃতিতে বেশ ছোটো হলেও পৃথিবীর ভয়ংকরতম প্রাণীর একটি। মশার কামড়ে হতে পারে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়াসহ নানা প্রাণঘাতী রোগ। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর অন্য যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে মশার কারণেই মৃত্যু হয় সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের। যার কামড়ে বহন করে অনেক ক্ষতিকারক ও জীবননাশক জীবাণু। মশার কামড়ে সৃষ্টি হয় এমন কিছু ভয়ংকর রোগ সম্পর্কে জানা যাক:

ডেঙ্গু

সাধারণত উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। জিকা বা চিকুনগুনিয়ার মতো স্ত্রী এডিস মশার মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। উচ্চমাত্রায় জ্বর, তীব্র মাথাব্যথা (মাথার সামনের অংশে), চোখের পেছনে ব্যথা, মাংসপেশিতে ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা, র‍্যাশ, বমি বমি ভাব, বিতৃষ্ণাবোধ ইত্যাদি এই রোগের উপসর্গ। ডেঙ্গু জ্বর প্রাণঘাতী হতে পারে।

চিকুনগুনিয়া

আফ্রিকা মহাদেশে এই রোগ বেশি হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ায়ও বেড়ে চলেছে। ডেঙ্গু ও জিকার ভাইরাস বহনকারী মশা এই রোগের কারণ। উপসর্গও ডেঙ্গুর মতো। তবে এই রোগে আক্রান্ত রোগী হাড়ের সংযোগস্থলে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। রোগটির কোনো প্রতিষেধক নেই।

জিকা

সম্প্রতিকালে মশাবাহিত ভয়ংকর রোগগুলোর মধ্যে জিকা অন্যতম। জিকা ভাইরাস যে রোগ সৃষ্টি করে তার নাম জিকা জ্বর। এর উপসর্গগুলো হলো জ্বর, মাথাব্যথা, অবসাদগ্রস্ততা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, শরীরে লালচে দাগ বা ফুসকুড়ি ইত্যাদি। গর্ভাবস্থায় শিশু ছোটো আকৃতির মাথা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে তুলনামূলক কম।

ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস

এটি মশাবাহিত একটি ভয়ংকর রোগ। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি স্নায়ুবিকভাবে দুর্বল হয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। এই রোগের ভীতিকর দিকটি হলো, এটি কোনো প্রকার উপসর্গ ছাড়াই দেখা দেয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি বুঝতেই পারে না যে তিনি ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসে আক্রান্ত। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

ওয়েস্টার্ন ইকুয়িন এনসেফালাইটিস

কিউলেক্স মশার কামড়ে এই রোগ হয়। জ্বর, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি এই রোগের উপসর্গ। সাধারণত বয়স্ক লোকেরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি এই রোগী দেখা যায়। তবে সংখ্যার বিচারে তা একেবারেই নগণ্য। ১৯৬৪ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা মাত্র ৭০০ জন।

ইয়োলো ফিভার

এর লক্ষণগুলো জন্ডিসের মতো। এই রোগ হলে সারা শরীর হলুদ রঙের হয়ে যায় এবং তীব্র জ্বর ও বমি বমি ভাব থাকে। আফ্রিকান দেশগুলোতে এই রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লিমফেটিক ফাইলেরিয়াসিস

মশাবাহিত রোগের মধ্যে লিমফেটিক ফাইলেরিয়াসিস কম

পরিচিত হলেও এটি খুব ভয়ংকর। রোগটি ফাইলেরিয়া ধরনের একটি মারাত্মক ইনফেকশন, যার প্রভাবে মানুষের পা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক গুণ ফুলে ভারি হয়ে ওঠে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

জাপানি এনসেফালাইটিস

এ রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী কিউলেক্স মশা। বাড়ির চারপাশের জলাভূমি ও স্থির পানি কিংবা কৃষি জমিতে জন্ম নেয়। মানবদেহে সংক্রমণের পর রোগটি কেন্দ্রীয় নার্ভ সিস্টেমে প্রবেশ করে। এছাড়া জ্বর, মাথাব্যথা ও বমি বমি ভাব হয়। এশিয়া এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

সেন্ট লুইস এনসেফালাইটিস

কিউলেক্স মশাবাহিত একটি ভয়ংকর রোগ এটি। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের রাজ্যগুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। উপসর্গ হিসেবে জ্বর, মাথাব্যথা ও বমি বমি ভাব ইত্যাদি হয়ে থাকে। তবে এর তীব্রতা বাড়লে আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েকদিনের জন্য সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যেতে পারে। শিশুদের তুলনায় বয়স্করা এই রোগের ঝুঁকিতে বেশি থাকে। রোগটির কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি।

লা ক্রস এনসেফালাইটিস

যে সমস্ত মশা গাছের কোটরে জন্ম নেয় তাদের কাছ থেকে এই রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা বেশি। বয়স্করা এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকলেও ১৬ বছরের নিচের বাচ্চাদের জন্য এই রোগ অত্যন্ত ভয়ংকর। আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ পাড়ের দেশগুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এই রোগের উপসর্গ হিসেবে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর ও বমি বমি ভাব হয়। তবে দীর্ঘ মেয়াদে এই রোগে ভুগলে আক্রান্ত ব্যক্তি শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

ইস্টার্ন ইকুয়িন এনসেফালাইটিস

যুক্তরাষ্ট্রের মশাবাহিত রোগের মধ্যে ইস্টার্ন ইকুয়িন অন্যতম। আমেরিকার ফ্লোরিডা, জর্জিয়া এবং নিউ জার্সিতে এই প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং যারা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বেঁচে যায় তাদের মস্তিষ্কে সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই।

ভেনিজুয়েলা ইকুয়িন এনসেফালাইটিস

উপসর্গ এবং ফলাফলের দিক দিয়ে এটি ইস্টার্ন ইকুয়িন গোত্রের রোগ। তবে এই রোগ গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিকর। কারণ এর ফলে অকালে গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, সারা বিশ্বে বছরে ১০ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে। ২০১৬ সালে ম্যালেরিয়াতেই মারা গেছে প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ। ডেঙ্গু ঝুঁকিতে আছে ১০০টি দেশের প্রায় ২৫০ কোটি মানুষ। ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই মশক নিধন হওয়া উচিত সার্বক্ষণিক কার্যক্রম। কারণ একেক মৌসুমে একেক মশার উপদ্রব বেড়ে যায়। গোটা বিশ্ব এখন কাঁপছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে। প্রতিষেধকহীন এই ভাইরাসে সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লাখের মতো মানুষ। আর মৃত্যু প্রায় ৫ লাখ ৮২ হাজার। এই ভাইরাসের প্রকোপে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বিশ্ববাসী। কোনো কোনো দেশে চলছে জরুরি অবস্থা। আবার কোনো দেশে লকডাউন। এদিকে, সারাবিশ্বে প্রতি বছর অনেক মানুষ মারা যায় মশাবাহিত রোগে। এছাড়া লাখ লাখ মানুষ মশার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এজন্য করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পেছনে মশার হাত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে বহু মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনা ভাইরাস ছড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে। স্পর্শ করলেও করোনা আক্রান্তের ঝুঁকি থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করে করোনা শনাক্ত করা গেলেও মশার মাধ্যমে এটি ছড়ায় না। অন্তত এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

বস্তুত মশা এখন সারা পৃথিবীতেই জনস্বাস্থ্যের জন্য বড়ো হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। মশাবাহিত রোগের মধ্যে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জাপানিজ এনসেফালাইটিস ছাড়াও ম্যালেরিয়াও উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ আরো বাড়বে।

মশার উপদ্রব থেকে জনগণকে রক্ষায় সরকার মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পালন করেই চলেছে। মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কীটনাশক (লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড) প্রয়োগ কার্যক্রম এবং জনসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ভূমিকা রেখে চলেছে। মশা বিশেষজ্ঞরা দেশে সফল মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জলাভূমি ও খানাখন্দ পরিষ্কার করার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। গৃহে ব্যবহৃত পাত্রে জমে থাকা পানি ফেলে দেওয়া এবং প্রাকৃতিক জলাধারের যত্ন সুপারিশ করা হয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে আরেকটি প্রয়াস

দেশের নারী উদ্যোক্তাদের নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম ওমেন অ্যান্ড ই-কমার্স (উই) ফোরামের নারী সদস্যদের বিশ্বখ্যাত 'এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ মাস্টারক্লাস (Entrepreneurship Masterclass 1.0)' সিরিজের আওতায় প্রশিক্ষণ দিয়ে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করবে সরকার। ১৮ই জুলাই জুম অনলাইনে উই-এর সদস্য নারীদের জন্য এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ মাস্টারক্লাস সিরিজ শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্পের সহযোগিতায় উই ফোরামের নারী সদস্যদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ মাস্টারক্লাস সিরিজ চালু করা হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, উই ফোরামের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ মাস্টারক্লাস সিরিজে আগামী ১২ মাসের প্রতি মাসে দুটি করে সেশনে বিদেশি এবং স্থানীয় উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ দেবেন। বিদেশিদের মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের প্রশিক্ষকরা রয়েছেন। সচিব জিয়াউল আলম বলেন, সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশ্বাস করে। এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ মাস্টারক্লাস সিরিজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দেশের নারীদের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার একটা অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই প্রশিক্ষণ। তিনি উই ফোরামের প্রত্যেক সদস্যকে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই সিরিজে বেশি করে স্থানীয় প্রশিক্ষক তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করে সচিব বলেন, স্থানীয় প্রশিক্ষক তৈরি হলে তারাই আগামীতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রতিবেদন : মো. সিরাজুল ইসলাম

আজি হতে শতবর্ষ আগে
গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

আজিকার কোনো ফুল, কোনো ফল
কিংবা সবুজ ধানের খেত, কোনো পাখির গান
নব বসন্তের সুপ্রভাত,
নীল আকাশের আরির রাঙা রবি, পূর্ণিমার চাঁদ,
আর বসন্তের সুশীতল হাওয়া
শরতের শিশির সিক্ত শিউলি, বকুল ও রাঙা পলাশ ফুল
কোনো নদ- নদী ও মহাসাগরের ঢেউ
কিংবা পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার স্বচ্ছ জল
হিজল, তমাল, শাল, জারুল, কিংবা ঝাউয়ের বন
কেউ কি জানিত কখনো
এই বাংলার বুকে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
এসেছিলেন- স্বদেশ প্রেমের শত অনুরাগে
আজি হতে শতবর্ষ আগে।
যাঁর হৃদয়ে ছিল ভালোবাসা
ছিল অসীম সাহস আর ধৈর্য অফুরান
স্বদেশের জন্য বিশ্ববিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন
রেস কোর্সের ময়দান,
নাম ছিল তাঁর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন বাংলার মহাভাগে
আজিকার কেউ কী জানিত কখনো
আজি হতে শতবর্ষ আগে।
জানি না কে পড়িবে এই কবিতা খানি
আজি হতে শতবর্ষ পরে
অগ্নি পুরুষকে জানিতে চাহিবে- কৌতূহল ভরে
জানার আকুল বাসনা আর অফুরন্ত অনুরাগে।
বাংলার স্থপতি মহান নেতা জন্মেছিলেন
আজি হতে শতবর্ষ আগে।

ভালোবাসার সেতু
রুস্তম আলী

ঈদ মানে ফকির- মিস্‌কিন
ধনি-গরিব মিলে হৃদয়ের বন্ধন
ঈদ মানে পাড়া-পড়শি-প্রতিবেশী
সবাই আমরা আত্মীয়স্বজন।
ঈদ মানে - স্বপ্নে পাওয়া দিন
ঈদ মানে- মন ভুলানো বীন।
ঈদ মানে- আল্লাহ মেহেরবান
ঈদ মানে- ভালোবাসার বাগান।
ঈদ মানে- কারো সাথে কারো
নাই কোনো লেনা-দেনা
ঈদ মানে - ভালোবাসার মেলা।
ঈদ মানে - হাজার বাধা পেরিয়ে
কোভিড-১৯ রুখে দিয়ে
ঈদের আনন্দ আজ ঘরে ঘরে।
ঈদ মানে- মনে প্রাণে
নাই কোনো হেতু
ঈদ মানে ভালোবাসার সেতু।

শতবছরের কুলুজি
মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

শত বছরের কুলুজি আর বিবর্ণ পঞ্জিকার খাতা খুলে
তোমাকে দেখছি খালপাড়ে, বটের নিঝুম ছায়ায়
গা-গতরে কাদা মাখানো, ধুলো মাটি লেপটানো
মায়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছো, সেই সন্ধেবেলা।
শত বছরের মধুমতির তীরে গোপাল বাবুর শহরে
তোমার হইচই, প্রতিবাদী হাঁক-ডাক আর অনুশীলন
বিদ্যাপিঠে সতীর্থদের নিয়ে ছাদ মেরামতের বায়না
নিমিষেই মেটানো হলো অসীম সাহসের বদলে অর্থ।
শতবছরের পাঁজিতে এখনো অম্লান মাদারীপুর-
বেকার হোস্টেল, ইসলামিয়া কলেজ ও কলকাতার ভাঙা
অলিগলি, মেজোবোনের বাসা, গঙ্গার জল ছইছই কূল
প্রিয় স্যার সাঈদুর, প্রিয় সতীর্থ সিরাজউদ্দীন ও শামসুদ্দীন।
শত বছরের এই নগরীতে রমনা, ঘোড়দৌড় মাঠ, পল্টন
আর্মানিটোলা, গুলিস্তানের পুরনো রেল ভবন, সদরঘাট
ধানমন্ডি লেকের পাড়ে গাছ- গাছালির ছায়ায় নিজের কুটির
কুলুজির পাতায় আঁকা ৫৫ বছরের কতশত বিমল ছবি।

বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাভিবাদন
সুষমা ফাল্গুনী

মহান নেতা বঙ্গবন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
তোমার আত্মত্যাগ, বিচক্ষণ নেতৃত্বে
বাংলাদেশ হয়েছে স্বাধীন
বাঙালি পেয়েছে স্বাধীনতা।
কে বলে তুমি নেই?
তুমি আছ বাংলার সর্বত্র।
কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে
রাজাধিরাজ হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে।
তুমি হারিয়ে যাওনি কালের আবর্তনে
বাঙালি তোমাকে রেখেছে মনে সযতনে।
বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা তুমি, বাঙালি জাতির পিতা
তোমাকে জানাই ভালোবাসা আন্তরিক শ্রদ্ধা।

মৃত্যুঞ্জয়ী
অমিত রেজা

বদলে বদলে যাই প্রতিক্ষণে
বদলে কি গেছি বলো আমরা
তবুও কি বদলে গেল বলো আমরা
তুমি কি মনে কর
সব ঠিক থাকে আগের মতন
একটি জায়গা স্থির।
সেই হয় পরিবর্তন মাপার স্কেল
ভালোবাসা ভালোবাসা আর সব বাদ।
তবুতো থাকে থাকবে ভালোবাসা!

লক্ষ্যহীন নয় কেউ

নাজমা ইসলাম

পথচারী হাঁটছে লক্ষ্যহীনভাবে
মনে হতে পারে
যদি শুধাও উত্তর পাবে
একেক জন হরেক রকম সবাই
একদমে এক দমে হাঁটছে
সারিবদ্ধ রুটমার্চে নিত্যরোজে
ওদের ডাকে পুলিশ সেনা বা
সীমান্ত পাহারায় যাদের তটস্থ থাকতে হয়
মনে হওয়া আর বাস্তব চিরকাল
সংঘাতপ্রবণ সবার মধ্যেই থাকে দ্বন্দ্ব
আলুথালু, দৃঢ় পদক্ষেপে অথবা ঢিমে তালে।

মৃত্যুর কথা ভাবে না

শাহরিয়ার নূরী

একেক স্বজন দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিচ্ছে
আজ হয়ত ফুপুর মেয়ে কাল বন্ধু
একজন শুধু কোভিড উনিশে আর সব
মরণব্যাধিতে– কানাডায় উত্তম ব্যবস্থা
সে দেশে বুকে ব্যথা লাবিবের, একদিন ভোরে
রাতের ঘুম চলল কবরে এখন
আহা, ছেলেটি ওর যে, কী চমৎকার
জীবন ছিল এমনি সুখের কেউ ভাবেনি
আসবে মরণ ভাবত হয়ত কেউ
আমাকে নিয়ে এখন সবাই আমার
মৃত্যুর কথা ভাবে না, তবে ...

প্রশ্ন শুনলে মনে হয় করোনা দেহে

সৈয়দ পারভেজ

আহার আছে নতুন এই মাস পুরো
যাহাঃ ওহ্ চলবে ঠিক দু'মাস
থাকবে হেথায় কতদিন বছর গড়াবে
চিকিৎসা হচ্ছে এমন প্রশ্ন শুনলে মনে হয় করোনো ধরেছে
চাল ডাল তেল নুন চিনি শুকনো মরিচ দুশিন্তা হবে না
বাসা থেকে বের হও জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে ঠিক একদিন
তাহলে বাজার পাশের ফ্ল্যাটের মিষ্টি মানুষ ও তার স্ত্রী
আর কিছু বলো নেই আপাতত ওহ্
বলো ভবিষৎ ভরসা বুঝলে না সাংবাদিক অন্ধকার সব ।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

আপন চৌধুরী

শুভদিনে জন্মগ্রহণ করে
শেখ লুৎফর রহমানের ঘরে।
তিনি পরিবারের আদরের খোকা
এলাকার মানুষের কাছে উপকারি মুজিব।
ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন সাহসী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদী।
যুক্ত বাংলার দুই প্রধানমন্ত্রী
শেরেবাংলা ও সোহরাওয়াদী,
পেয়েছিলেন যোগ্য উত্তরসূরি
মুজিব হয়ে উঠলেন সবার নয়নমণি।
বাঙালি পেল যোগ্য নেতার নেতৃত্ব
মুজিব দেখল সোনার বাংলার স্বপ্ন।
জনতা পেল বিশ্বস্ত এক বন্ধু
স্বাধীনতাকামী মানুষের তিনি প্রিয় বঙ্গবন্ধু।
লাল-সবুজের বুকে উদিত সূর্য
বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন এক ভূখণ্ড।
জাতির পিতার ভাষার নামে দেশ
সেটি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।
হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি থাকবে বাংলাদেশের
মানুষের হৃদয়ে চিরঅম্লান।

কালের দেখা

ইফফাত রেজা

একটি সুর বাজে, কে বাজায়
রোদেলা দুপুরে, মধ্য গগনে কিংবা
প্রভাতবেলায়, মাঝের সোনালি রোদ্দুরে
তুমি আমার প্রভাত পাখির গান।
সেই অচেনা অদেখা পাখির দেখা
হয়নি কোনো কালে। কালের খেয়া ডাক দিয়ে
যায়। হায় পাখি তুমি অচেনাই রয়ে গেলে।

তন্দ্রা হরণি

রাবেয়া নূর

নয়নের সামনে তুমি নাই
আছো হৃদয়জুড়ে, কাননে ডাকলে পাখি
আমি চকিত হই, তুমি কি এলে?
রাতের তারারা বাতায়ন খুললেই
উঁকি দেয় আমার ঘরে, জ্যোৎস্নার প্লাবণ
ডাক দিয়ে যায় আঁধার রাতে
হে আমার তন্দ্রা হরণি।

শহিদের উত্তরাধিকার

রফিকুর রশীদ

কথাটা সেদিনও উঠেছিল মানুষের মুখে মুখে–মতিনউদ্দীনেরও তাহলে পুলিশের চাকরিই হলো!

চাকরির বাজার যথেষ্ট আক্রা সে কথা সত্যি। সরকারি-বেসরকারি কোনো চাকরিই সুলভ নয়। উপর মহলে লোক থাকা লাগে, নইলে বাম হাতে পুজো দেবার জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগে। মতিনউদ্দীনের তো এ রকম বাড়তি যোগ্যতা বলতে কিছু নেই। তাহলে এটা কী করে সম্ভব হলো–লেখাপড়ার পাট শেষ না হতেই একেবারে খোদ সরকারি চাকরি! সাব-ইন্সপেক্টর এমন বড়ো কোনো পদ নয়, তবু বিনা পয়সায় পুলিশের চাকরি হয়েছে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করতেই চায়নি। এ কি সত্য যুগ পেয়েছে, মুখে বললেই হলো! এ হচ্ছে কলি যুগ, ভেতরে কিছু একটা গুড়-চিনি ঠিকই আছে, এখন আড়াল করতে চাইছে করুক; ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, একদিন আপনাআপনি সত্যিটা বেরিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, পুলিশের এসআই-এ কি মাংনা কুড়িয়ে পাওয়া মাকাল ফল! বললেই হলো–টাকাপয়সা কিচ্ছু লাগেনি!

এসব সেই কবেকার কথা! মতিনউদ্দীনের মা-বাবার দিব্যি মনে আছে–সেদিন এই চাকরিপ্রাপ্তির ঘটনা নিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ির উঠোনে রীতিমতো মিটিং বসে। সেই মিটিংয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন মতিনউদ্দীনের বড়ো চাচা খবিরউদ্দীন মুন্সি। এ উঠোনে তার পা পড়ে না বহু বছর। মতিনউদ্দীনের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে উল্লসিত হয়ে ছুটে আসেন তিনি, ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়েন,

'কইরে জসিমউদ্দীন, আমার পুলিশ-ব্যাটা কই?'

জসিমউদ্দীন ঘর থেকে বাইরে এসে তো অবাক,

'মিয়াভাই আপনি!'

'বংশের বাতি আমাক ডাকছে, আমি না আইসি পারি!' খবিরউদ্দীন মুন্সি কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নাম ধরে ডাকেন–'কই আমার বাপজি কই? মতিনউদ্দীন?'

'মতিনউদ্দীন তো বাড়ি আসিনি মিয়াভাই।'

'বাড়ি আসিনি?'

'না সে ঢাকাতেই আছে। তার চিঠি আয়িচে-পুলিশের চাকরি হয়িচে।'

ততক্ষণে আরো অনেকে এসে জোটে উঠোনে। নারী-পুরুষ, ছেলে-ছোকরা সব রকম মানুষ আছে। সবার জন্যে বসার জায়গা সংকুলান সম্ভব হয় না। ঘরের মধ্যে থেকে হাতলভাঙা একটা চেয়ার নিয়ে এসে মতিনউদ্দীনের মা সামনে এগিয়ে ধরে বলে,

'আপনি বসেন মিয়াভাই।'

চেয়ার টেনে বসে পড়েন খবিরউদ্দীন মুন্সি, ছোটো ভাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন,

'কই সে চিঠি দেখি! সরকারি চিঠি নাকি?'

'না না, মতিনউদ্দীনের লেখা চিঠি। সে জানতি চায়িছে–এই চাকরি করবে কি না।'

'বলো কী জসিমউদ্দীন, চাকরি করবে না মানে! এ কি ছেলের হাতের মোয়া? কই দেখি সে চিঠি!'

ছেলের লেখা চিঠি আনার জন্যে জসিমউদ্দীন ঘরের মধ্যে ঢুকলে খবিরউদ্দীন মুন্সি ঘাড় ঘুরিয়ে নাতি সম্পর্কের এক ছোকরাকে চশমা আনতে পাঠান বাড়িতে। তারপর পকেট থেকে একশ টাকার নোট বের করে অন্য একজনের হাতে দিয়ে বলেন,

'বাজার থিকি খুরমা-মিঠাই আন্‌গা যা। এত বড়ো সুখবর, মিষ্টিমুখ না হলি চলে!'

জসিমউদ্দীনের চাচাতো ভাই খবিরউদ্দীন মুন্সি গ্রামের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ, নিকটস্থ থানা শহরে মুন্সি ট্রেডার্স নামে ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান দেখভাল করে তার দুই ছেলে। একাত্তরের যুদ্ধের সময় জসিমউদ্দীন একবারে শৈশবে পিতৃহীন হয়ে পড়লে পৈত্রিক সহায় সম্পত্তিও কেমন করে যেন বেহাত হয়ে যায়। এজন্যে আড়ালে আবডালে কেউ কেউ খবিরউদ্দীন মুন্সি এবং তার বাবা দবিরউদ্দীন মুন্সির দিকে সন্দেহের আঙুল তুলে দেখায়। দবিরউদ্দীন ভাটপাড়া তহশিল অফিসে পিওনের চাকরির সুবাদে জমিজমার পোকা হয়ে ওঠেন। তার পক্ষে অনেক কিছুই হয়ত সম্ভব। অনাথ ভাইপো জসিমউদ্দীনকে ভূমিহীন দেখিয়ে দু'বিঘে খাসজমির বন্দোবস্তও তো করিয়ে দেন এই দবিরউদ্দীন মুন্সি। ভাগ্যের ফেরে সম্পত্তি ধরে রাখতে পারেনি বলে কারো বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ নেই জসিমউদ্দীনের। জীবনে নানান পেশা বদলের পর অনেক দিন থেকে থিতু হয়েছে মেকানিক্সের পেশায়। রেডিও-টেলিভিশন মেরামত করে। তার হাতের কাজের মোটামুটি সুনাম আছে। থানা শহরে ছোট্ট এক দোকানে বসে মেরামতের কাজ করে সংসার চালায়। মেধাবী ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব গর্ব তার বুকের ভেতরে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় মেয়েটির বিয়ে দিতে হয়েছে বছরদুয়েক আগে। এখন সে ভালো আছে। ছেলের লেখাপড়া শেষ হলে তার ছুটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়ে। এই তো আর বছরখানেক। কিন্তু আকস্মিকভাবে মতিনউদ্দীনের চিঠি এসে সহসা চিন্তার জগৎ এলোমেলো করে দেয়। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিজে নিয়ে নিলেই বেশ পারে, পাগল ছেলে মূর্খ বাপের মতামত জানতে চেয়েছে–এই চাকরিতে জয়েন করবে কিনা। জসিমউদ্দীন ছেলের চিঠি হাতে করে প্রথমে যায় হাইস্কুলের হেডমাস্টারের কাছে। মতিনউদ্দীন সব স্যারের প্রিয় ছাত্র, তার কাছে অনেক প্রত্যাশা তাদের। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর শুনে সবাই একমত হতে পারেন না। হেড স্যার তো বলেই ফেলেন-লেখাপড়া শেষ হোক, ওর জন্যে চাকরির অভাব হবে না। কয়েকজন শিক্ষক এই চাকরিতে জয়েন করার পক্ষে অভিমত দেন। মূলত মতিনউদ্দীনের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদটা এই স্কুল থেকেই কানে কানে ছড়িয়ে পড়ে।

গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা মতিনউদ্দীনের চিঠি পড়ে খবিরউদ্দীন মুন্সি প্রথমে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে, ভাবনা হয়–এ কী লিখেছে ছেলেটা! নিজের উপরে তার এত বিশ্বাস–'ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভালো চাকরিও পেতে পারি, হয়ত সময় লাগবে।' মানুষের বড়ো বড়ো স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন,

'বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে এই ছেলে। একে কি আটকে রাখা যায়!'

এ বাক্যের কী যে মানে হয় সে কথা বুঝা মুশকিল। পুলিশের এসআই পদে মতিনউদ্দীনের চাকরি গ্রহণ তিনি সমর্থন করছেন কি-না সেটা স্পষ্ট হয় না। চিঠির উপরে আরো এক দফা চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ করেন সে চিঠি। জসিমউদ্দীন হাত বাড়িয়ে চিঠি গ্রহণ করতে করতে জানতে চায়,

'আপনার মতামত কী মিয়াভাই?'

'ভাবছি আমাদের মতিনউদ্দীন আর কত বড়ো হবে!' মিয়াভাই হঠাৎ দার্শনিকের মতো ভারি প্রশ্ন তুলে ধরেন, 'মানুষ কত বড়ো হয়?'

নিজের প্রশ্নের উত্তর পাবার বদলে উলটো এ রকম ভাবগম্ভীর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে সে কথা ভাবতেই পারেনি জসিমউদ্দীন। তাই মুখ কাচুমাচু করে সে জানায়,

'কী যে বোলেন মিয়াভাই! সবই আপনাদের দোয়া। মতিনউদ্দীনকে এমএ পাস তো করতিই হবে।'

দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে খবিরউদ্দীন মুন্সি বলেন,

'তা তো করবেই। এমএ পাস করবে, অনেক বড়ো চাকরি করবে, অনেক বড়ো মানুষ হবে–কত স্বপ্ন তার! ভাবছি স্বপ্নই বা কত বড় হয় মানুষের!'

পেছনে গুঞ্জন শুরু হয়। এসব ভারি কথাবার্তা ছেলে ছোকরাদের ভালো লাগে না। খবিরউদ্দীন মুন্সি সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

'তুমরা এখন যাও দিনি, ভাইয়ে ভাইয়ে আমরা একটু কতা বুলি। তুমরা যাও।'

হাতে মিঠাই পেয়ে ধীরে ধীরে সবাই সরে গেলে জসিমউদ্দীনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে তিনি একান্তে জানতে চান,

'এই চাকরির জন্যি খরচখর্চা কত হলু বোলো দিনি জসিমউদ্দীন!'

এমন গোপন এবং গভীর প্রশ্নের উত্তরে জসিমউদ্দীন অতি সহজে ঘোষণা করে,

'এক পয়সাও খরচ হয়নি মিয়াভাই।'

খবিরউদ্দীন মুন্সির কণ্ঠে প্রবল অবিশ্বাস,

'এ যুগে বিনি খর্চায় চাকরি হয়! তাও কিনা পুলিশের চাকরি। এতই সোজা!'

এ আলোচনায় ভয়ানক অস্বস্তি হয় জসিমউদ্দীনের। নিরুপায় হয়ে সে বলে,

'আমি ট্যাকা পাব কুতায়?'

'অনেক টাকার ব্যাপার, সে তো ঠিকই। তাও কত লাখ–বোলো দিনি শুনি!'

জসিমউদ্দীন এক প্রকার আর্তনাদ করে ওঠে,

'লাখ ট্যাকা তো আমি চোখেই দেখিনি মিয়াভাই!'

একই উত্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনতে ভালো লাগে না খবিরউদ্দীন মুন্সির। তার মানে জসিমউদ্দীন তাকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই গোপন কথাটা প্রকাশ না করে শোনাচ্ছে–'লাখ ট্যাকা তো চোখেই দেখিনি।' মনে মনে গজর গজর করে ওঠে-এ্যাদ্দিন দ্যাখোনি, এইবার দ্যাখ্পা লাখ লাখ টাকা। পুলিশের এসআই, ট্যাকা নিবা কত! ট্যাকার গাছ জন্মাবে এই বাড়িতি।

মিয়াভাইয়ের মনের কথার গজ্গজানি টের পায় না জসিমউদ্দীন। তাই সে সরল অন্তরে আবারও জানতে চায়,

'তা হলি মতিনউদ্দীন কি এই চাকরিতি যাবে মিয়াভাই?'

এ প্রশ্নেরও সোজা উত্তর না দিয়ে খবিরউদ্দীন মুন্সি সহসা স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, গলার স্বর এক ধাপ নামিয়ে এনে প্রশ্ন করেন,

'বড়াব্বার চিহারা কি তোর মনে পড়ে জসিম?' নিজেই আবার উত্তর দেন, 'নাহ, একাত্তরে তোর বয়স কত– বড়ো জোর বছর পাঁচেক, মনে পড়বে কী কইরি! আমার কিন্তু বেশ মনে আছে। খাকি পোশাক পরা বড়াব্বার চিহারাই য্যানে দেখতি পাচ্ছি মতিনউদ্দীনের চিহারার মদ্যি।'

কথা কোন প্রসঙ্গ থেকে কোন প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে জসিমউদ্দীন যেন তার খেই ধরতেই পারে না। বড়াব্বা মানে হচ্ছে বড়ো আব্বা অথবা বড়ো চাচা। তিন ভাইয়ের মধ্যে জসিমউদ্দীনের প্রয়াত পিতা জামালউদ্দীন ছিলেন সবার বড়ো। তিনিই বড়ো আব্বা। চাকরি করতেন পুলিশে। এতদিন পর তারই নাতি চাকরি পাচ্ছে পুলিশ বিভাগে, এ সময়ে তার কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। একাত্তরে খবিরউদ্দীন মুন্সি ৯/১০ বছরের কিশোর, অকাল প্রয়াত বড়ো চাচার ছবি তার শৈশবস্মৃতির কোনো হলুদপাতায় সাঁটা থাকতেও পারে, সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এ সময়ে সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের মানে কী? গভীর সেই অর্থ খুঁজে বের করার আগেই খবিরউদ্দীন মুন্সি বিশেষ একদিকে ইঙ্গিত করে জানতে চান,

'পুলিশের নাতি–এ পরিচয়টাও মতিনউদ্দীনের কাজে লাগতে পারে!'

জসিমউদ্দীন আগের মতোই অসহায় ভঙ্গিতে বলে,

'আমি তো এ সবের কিছুই জানিনি মিয়াভাই!'

কুপিত কণ্ঠে খবিরউদ্দীন মুন্সি জিজ্ঞেস করেন,

'বড়াব্বা যে মুক্তিফোজ ছিল, সিডা মনে আছে তো?'

মুক্তিযুদ্ধেরও বেশ কয়েক বছর পর আবিষ্কৃত হয় রংপুর জেলার রৌমারি সীমান্তের এক সম্মুখযুদ্ধে শহিদ হন সিপাহী জামালউদ্দীন। একাত্তরের শুরুতে বদলি সূত্রে রংপুরে যাবার পর থেকে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় পরিবারের সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সম্ভাবনার কথা উঠলেও এলাকার অনেকে সে কথা

বিশ্বাস করতে চায়নি। দু-তিন বছর পর পুলিশের উপর মহল থেকে জসিমউদ্দীনের মায়ের নামে সরকারি চিঠি এলে তখন জানাজানি হয়–এই গ্রামের সন্তান জামালউদ্দীন চাকরিরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে রৌমারি সীমান্তে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে শহিদ হন। সেই সীমান্ত এলাকায় কখনো যাওয়া হয়নি জসিমউদ্দীনের। পুত্রের মুখে একবার শুনেছিল রৌমারি উপজেলার এক ছেলে তার রুমমেট হয়েছে, তার মাধ্যমে দাদুর কবরের লোকেশনটা শুনে বুঝে নিয়ে সে একবার সেখানে যেতে চায়। কিন্তু সেই যাবার আর সময় হলো কই, এরই মধ্যে এলো চাকরির খবর, তাও কি-না পুলিশের চাকরি। অনেকক্ষণ চুপচাপ চিন্তাভাবনার পর খবিরউদ্দীন মুন্সি শেষ ঝাঁকুনি দিয়ে দেখতে চান চাচাতো ভাই জসিমউদ্দীনকে,

'মুক্তিযোদ্ধা-কোটার কোনো খবর জানা আছে তুমার? নাতি-নাতনিরাও কি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে আজকাল?'

জসিমউদ্দীনের মুখে কথা সরে না, কী জবাব দেবে প্রশ্নের! বয়সে এবং সম্পর্কে বড়ো ভাই হয়েও খবিরউদ্দীন মুন্সি তার ভ্রাতুষ্পুত্রের চাকরিপ্রাপ্তির আড়ালে আবোল-তাবোল কী যে সব খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সে কথা ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে জসিমউদ্দীনের। তবু মাথা ঠান্ডা রেখে সে জানায়,

'আপনাদের দোয়ায় মতিনউদ্দীন নিজির চেষ্টাতেই চাকরি পায়িছে মিয়াভাই, সে জানতি চায়িছে– এই চাকরিতে যাবে কি-না। আপনি একটা মতামত দিলি ভালো হয়।'

কথার ধারা শুনে খবিরউদ্দীন মুন্সির মনের ভেতরে আবার খচ্‌খচানি শুরু হয়, উথ্‌লে উঠতে চায় কথার ঢেউ–আমার মতামত নিবা তুমি! তুমার ডাঁট হয়িচে কত আমি টের পাইনি! নিজির চেষ্টায় চাকরি পায়িচে তুমার ব্যাটা, আল্লাদে মাতায় উঠতি চায়! মুক্তিযোদ্ধার মইয়ে চইড়ি তার আবার ক্যাদ্দানি! আমার মতামত নিবা তো কই ব্যাটার চিঠি হাতে নিয়ি আমার বাড়ি যাওনি তো! মন্যযমুনার এত সব উথাল-পাথাল ঢেউ চোখ বন্ধ করে চাপা দিয়ে খবিরউদ্দীন মুন্সি এক গাল হাসি ফুটিয়ে বলেন,

'মতিনউদ্দীন সরকারি চাকরি পায়িচে, এ তো বিরাট আনন্দের কতা! চাকরি করবে না মানে! ভালো চাকরি পালি ভালোডাই করবে। এ্যাখুন যিডা পায়িচে, সিডা কি কমা চাকরি নাকি! এ্যাঁ?'

এতক্ষণে মিয়াভাইয়ের স্পষ্ট অভিমত জেনে জসিমউদ্দীন খুশিতে গদগদ হয়ে ওঠে,

'তালি পারে মতিনউদ্দীনকে এই কথা জানিয়ি দিই।'

'হ্যাঁ, শুভ কাজে দেরি করতি নি। জানিয়ি দ্যাও। আমার কথাও জানায়।' এই পর্যন্ত বলার পর চেহারাটা একটু পালটে যায়, দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলেন, 'তবে আমার একখান কতা আছে জসিমউদ্দীন।'

মতিনউদ্দীনের চাকরিতে যোগদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি জসিমউদ্দীনেরও পছন্দ হয়েছে। গরিব মানুষের ছেলে বিনি-খর্চায় সরকারি চাকরি পেয়েছে, সে-চাকরি করবে না কেন? হাতের ধন পায়ে ঠেলতে নেই। চাকরিতে যোগ দেবার পরামর্শই দিতে চায় সে। তার মায়েরও ইচ্ছে তাই। স্কুলের টিচারদের মধ্যেও অনেকে একমত হয়েছে। আবার এই সন্ধ্যেবেলায় মিয়াভাই নিজে এসে সব কিছু শোনার পরে যখন পরামর্শ দিলেন, এরপরে আবার কথা থাকতে পারে নাকি! কিন্তু মিয়াভাই যে বলছেন, 'একখান কতা আছে।' কী হতে পারে সেই কথা! এত ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে ফেললেই তো হয়! মতিনউদ্দীনের মায়ের সঙ্গে এক পলকের চোখাচোখিও হয়, কিন্তু সেখান থেকেও বিশেষ কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ওদিকে মাথা নিচু করে বসে আছেন মিয়াভাই। কী যেন গভীর চিন্তা তার মাথায়। হঠাৎ জসিমউদ্দীনের মনে তৃতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণকায় এক সম্ভাবনা উঁকি দেয়। মনে মনে বেশ হাসিও পায়। সে যা ভাবছে তা-ই যদি ঠিক হয়, তাহলে বড়ো ভাই হয়ে সে-প্রস্তাব তিনি নিজে মুখে বলবেনই বা কেমন করে! আচ্ছা মনের কথা আপাতত মনে রাখলেই তো পারেন মিয়াভাই, এত তাড়াহুড়োর কী আছে! তার ছোটো মেয়ে আলেয়া সবে কলেজে উঠেছে, এমন তালপাকার মতো সেয়ানা তো হয়ে যায়নি যে বোঁটা থেকে খসে পড়বে! তবে কি মতিনউদ্দীনের চাকরি প্রাপ্তির সংবাদই মিয়াভাইকে এমন তটস্থ করে তুলেছে! তিনি কি একেবারে গোড়াতেই প্রস্তাব পোক্ত করে রাখতে চান! শেষ পর্যন্ত জসিমউদ্দীনকেই মুখ খুলতে হয়, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে জানতে চায়,

'কী কতা বুলতি চাচ্ছেন মিয়াভাই? এ্যাখুনই বোলবেন, না পরে বুললিও হবে?'

খবিরউদ্দীন মুন্সি সহজভাবেই উত্তর দেন,

'কতা এমন কিছুই না। ভাবছি আমাদের মতিনউদ্দীনের কতা।'

'কী ভাবছেন আপনি আমাক খুইলি বোলেন দিনি।'

'এত বড়ো বিদ্বান ছেইলিরও শেষে চাকরি হলু সে পুলিশ ডিপার্টমেন্টেই!'

জসিমউদ্দীন সহাস্য ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দেয়,

'ও এই কতা! আপাতত করুক এই চাকরি। অন্য চাকরি পালি না হয় ছাইড়ি দেবে ইডা।'

এতক্ষণ পর হঠাৎ খবিরউদ্দীন মুন্সির চেহারায় অন্য রকম পরিবর্তন আসে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফ্যাঁচ করে কেঁদে ওঠেন। কাঁধের হাজি-গামছায় চোখমুখ মুছে তিনি কঠিন এক তুলনা টেনে বলেন,

'আমার বড়াব্বা শহিদ হয়িচেন পুলিশ হবার কারণে, আমাদের মতিনউদ্দীনও পুলিশ হচ্চে, আবার তার যদি কিছু হয়!'

সে ছিল যুদ্ধের বছর। শুধু জামালউদ্দীন তো নয়, পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্যই দেশের স্বাধীনতার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অনেকে শহিদও হয়েছেন। স্বাধীন দেশে এখন যুদ্ধবিগ্রহ কিসের! সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বসে মতিনউদ্দীনের বাপ-চাচা এভাবে যুক্তি সাজিয়ে সেদিন অমঙ্গল–ভাবনা উড়িয়ে দেন।

দুই

শহিদ সিপাহী জামালউদ্দীনের প্রপৌত্র মতিনউদ্দীন যথাসময়ে পুলিশের চাকরিতে যোগদানের পর কী যে এক অদৃশ্য আঠায় জড়িয়ে পড়ে, পুলিশ বিভাগ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া হয় না তার। নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে প্রমোশন পেয়ে ইন্সপেক্টর হয়েছে, আরো একটা প্রমোশন নাকের ডগায় ঝুলছে। এরপরের পদ অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার, সংক্ষেপে এএসপি। ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন অপেক্ষা বিসিএস-এর মাধ্যমে সরাসরি এএসপি নিয়োগেই বর্তমানে সরকারের আগ্রহ অধিক। মতিনউদ্দীনও যে-কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত, সে লড়াই করেই অর্জন করতে চায় ভালো কিছু। কিন্তু অনেক সময় ব্যাটে বলে সংযোগটা হয়ে ওঠে না। ফলে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ফলাফল শূন্যই থেকে যায়। মতিনউদ্দীনের হয়েছে তাই। কারণ যা-ই থাক, এমএ পরীক্ষাও দেওয়া হয়নি তার, বিসিএস পরীক্ষাতেও অংশগ্রহণ হয়ে ওঠেনি। দূর খাগড়াছড়িতে বসে কপাল চাপড়েছে আর নিজেকে শুনিয়েছে

স্বগতোক্তি–দাদু ছিল সেপাই, তুমি হয়েছ ইন্সপেক্টর, অফিসার ইন চার্জ; আর কতদূর যেতে চাও জাদু! সবাই কি মগডালে উঠতে পারে! তোমার বংশে আবার যদি কেউ পুলিশ হয়, বাকি পথ না হয় তার জন্যেই ফেলে রাখো।

হ্যাঁ, বিলম্বে হলেও সিপাহী জামালউদ্দীনের বংশলতিকায় আরো দুটো আনন্দকুসুম ফুটেছে, মতিনউদ্দীন তাদের ফুলের নামে নাম রেখেছে–পলাশ, শিমুল। বিলম্বের কারণ হচ্ছে পরীক্ষার ঘোরে থাকা। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ তার হয়েই ওঠে না, ঠিক পরীক্ষার সময়ে অপ্রত্যাশিত এক বাধা এসে পথ আগলে দাঁড়ায়, অথচ পরীক্ষার ঘোর কাটে না কিছুতেই, মনে হয়–সামনের বছর ঠিক হয়ে যাবে সব। বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি। চাচাতো বোন আলেয়া আর কতদিন অপেক্ষা করবে! খবিরউদ্দীন মুন্সি ব্যক্তিত্বের ছড়ি ঘুরিয়ে ছোটো ভাই জসিমউদ্দীনকে কৌশলে এক সময় মুঠোর ভেতরে আনতে পারলেও তার অতি আদরের ছোটো মেয়ে আলেয়া চলে যায় মুঠোর বাইরে। ভালোবাসার পাত্রের হাত ধরে সে উড়াল দেয় দূর অজানায়। ব্যাপারটা মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ালে আলেয়া টেলিফোনে মতিনউদ্দীনেরই সহযোগিতা চায়। চাচাতো ভাই পুলিশ অফিসার, বোনের জন্যে কিছুই করবে না তাই হয়! নিকটস্থ থানায় ফোন করে এ উপকারটুকু সে করেছে। এ নিয়ে খবিরউদ্দীন মুন্সির সে কী তর্জন গর্জন! বাবার মাধ্যমে সবই শুনতে পেয়েছে, কিন্তু কানে তুলতে চায়নি মতিনউদ্দীন।

সবদিক সামলে উঠে বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সত্যি একটু বিলম্ব হয়ে যায়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে মতিনউদ্দীনের বিয়ে দিয়ে যেতে পারে তার বাবা জসিমউদ্দীন। নাতিদের মুখ দেখার সুযোগ আর হয়নি। পলাশ-শিমুল এসেছে আরো পরে। দাদুকে পায়নি, তারা পেয়েছে দাদির আদর-সান্নিধ্য। মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে মতিনউদ্দীন গ্রামের পাট এক প্রকার গুটিয়ে ফেলেছে।

গ্রাম থেকে আসার সময় একটা ভাঙাচোরা টিনের সুটকেস সঙ্গে নিয়ে আসে মতিনউদ্দীনের মা। এতটাই ভাঙা যে সেই সুটকেসের কোমরে দড়ির বাঁধন দিয়ে রাখতে হয়। পলাশ-শিমুল এ নিয়ে হাসাহাসি করে, ভেতরের কাপড়চোপড় উল্টে দিতে চায়। মতিনউদ্দীন ভালো লাগেজ-ব্যাগ কিনে দিয়েছে। লাভ হয়নি তাতে। এ নাকি তার শ্বশুর-শাশুড়ির মূল্যবান স্মৃতি, ভাঙা সুটকেস কিছুতেই বেহাত করবে না। জসিমউদ্দীনেরও বেশ মনে পড়ে–ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছে এই টিনের সুটকেস। সারা গায়ে লাল-সবুজ রঙের ছোপ। গাছের ডালে টিয়ে পাখির লম্বা লেজ ঝুলে আছে। লাল টুকটুকে তার ঠোঁট। এসব ছবি এখন কোথায় হারিয়ে গেছে। টিনের গায়ে মর্চে ধরেছে সেই কবে! পলাশ-শিমুলের দাদি তবু পুরানো কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে অতি যত্নে ঢেকে রাখে শাশুড়ির স্মৃতিমাখা-নকশা আঁকা সুটকেস।

একদিন সেই সুটকেসের বুক পকেট থেকে পুরাতন এক চিঠি আবিষ্কার করে পলাশ। এতই পুরানো সেই চিঠি যে বাবার হাতে জমা দিতে গিয়ে তার ভাঁজ থেকে ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হয়। চিঠির লেখক সিপাহী জামালউদ্দীন। লিখেছেন তার স্ত্রীর কাছে। মতিনউদ্দীন অবাক হয়ে যায় দাদুর হস্তাক্ষর দেখে। স্বল্প শিক্ষিত মানুষের এত চমৎকার হাতের লেখা! পলাশ-শিমুলকে প্রশ্ন করে–'পারবি তোরা আমার দাদুর মতো সুন্দর করে লিখতে?' এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পলাশ হঠাৎ জানতে চায়,

'তোমার দাদির নাম কি পাখি?'

'পাখি!' মতিনউদ্দীন তো দাদিকে দাদি বলেই জানে, নাম শুনেছে বলে তো মনে পড়ে না। মাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যায়। কিন্তু সে পত্রপাঠে মনোনিবেশ করে। দাদির সত্যিকারের নাম পাখি হোক অথবা দাদু আদর করেই ওই নামে ডাকুক, চিঠি পড়ে অভিভূত হয়ে যায় মতিনউদ্দীন। অবুঝ স্ত্রীর ধারণা–পুলিশের চাকরি ভালো না, এ চাকরির কারণেই তার স্বামীকে দূর দেশে থাকতে হয়। দাদু নানান কথায় বুঝ দেবার চেষ্টা করেছেন চিঠিতে। ভোট হয়ে গেছে। এইবার বাঙালির দুঃখ ঘুচে যাবে। আগামী বছর নাগাদ তিনি তার পাখিকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। সবশেষে স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেছেন–পুলিশের চাকরি কিন্তু খারাপ না। বিপদে পড়লেই মানুষ পুলিশের কাছে আসে। এই চাকরিতে থেকে অনেক মানুষের উপকারও করা যায়।

এই চিঠি পড়ার পর মতিনউদ্দীনের সারা গায়ের লোম শিউরে ওঠে, শ্রদ্ধায় আবারো মাথা নুয়ে আসে শহিদ সিপাহী জামালউদ্দীনের প্রতি। বহুদিন পর আবার তার মনে হয়–পুলিশের চাকরিতে এসে আমি তাহলে ভুল করিনি। বিপদে-আপদে আমিও তো মানুষের পাশে দাঁড়াতেই চাই।

তিন

এদেশে সেই কবে যুদ্ধ হয়েছে ১৯৭১ সালে। সেই যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন পুলিশবাহিনীর সদস্য সিপাহী জামালউদ্দীন। সে ছিল ভয়ংকর সব অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদের যুদ্ধ। বুকে একটা গুলি লাগলেই সব শেষ। যুদ্ধ থেকে গেছে সেই একাত্তরের ডিসেম্বরে। তবু ভ্রাতুষ্পুত্র মতিনউদ্দীনের জন্যে খবিরউদ্দীন মুন্সির কত না আতঙ্ক আর আশঙ্কা-পুলিশের চাকরি মানেই তো বন্দুক-রাইফেল গোলাগুলির কারবার, পুলিশের যুদ্ধ সব সময়।

আহা, খবিরউদ্দীন মুন্সি কিংবা তার চাচাতো ভাই জসিমউদ্দীনের দেখে যাবার সুযোগ হয়নি ২০২০ সালের অভিনব এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদের কোনো দাম নেই এই যুদ্ধে। শুধু বাংলাদেশে নয়, অদৃশ্য এই ঘাতকের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। ভয়ানক এ যুদ্ধে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন ডাক্তার-সিস্টার-স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ-আর্মি-সংবাদকর্মী। লড়তে লড়তে শহিদের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম।

পুলিশ বিভাগে মতিনউদ্দীনের চাকরি প্রাপ্তিতে একদিন আনন্দের সঙ্গে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছিলেন যে খবিরউদ্দীন মুন্সি, কে জানত তার আশঙ্কা কখনো এভাবে নির্মম সত্যে পরিণত হবে–বিনা গোলাগুলিতেই এবার শহিদ হবে একাত্তরের শহিদ সিপাহী জামালউদ্দীনের দৌহিত্র ইন্সপেক্টর মতিনউদ্দীন!

একদিন টেলিভিশন-সংবাদের নিয়মিত পরিবেশনা 'করোনা পরিস্থিতি'র দীর্ঘ ফিরিস্তির এক ফাঁকে উচ্চারিত হয় মতিনউদ্দীনের নাম। প্রতিদিন মৃত্যু সংবাদ পড়তে পড়তে এতই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে বাগযন্ত্র যে সুন্দরী সংবাদ-পাঠিকার কণ্ঠস্বর একটুও কেঁপে ওঠে না, একটুও ছল্‌কে ওঠে না বেদনায়; অবলীলায় পরিবেশিত হয় সংবাদ–কর্তব্যরত অবস্থায় ইন্সপেক্টর মতিনউদ্দীনের দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেলে পুলিশ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি করার তিন দিন পর তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তার পরিবারে ছিল দুই শিশুপুত্র, স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ২৮শে জুলাই ২০২০ বঙ্গভবনে নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সাহারা খাতুন ছিলেন একজন পরীক্ষিত নেতা

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১০ই জুলাই এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, সাহারা খাতুন ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন পরীক্ষিত নেতা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে তিনি গণতন্ত্রের বিকাশসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিককে হারালো। রাষ্ট্রপতি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, ৯ই জুলাই থাইল্যান্ডের ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন মারা যান।

মৎস্য খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরে মৎস্য খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২১ থেকে ২৭শে জুলাই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কোভিড-১৯ মহামারিজনিত বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখতে মুজিব শতবর্ষের চেতনায় একাত্ম হয়ে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি'– যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'মাছে ভাতে বাঙালি' বাঙালির শাশ্বত এই পরিচয়েই নিহিত রয়েছে জাতীয় জীবনে মৎস্যের গুরুত্ব। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে মৎস্য খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংর মাধ্যমে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সব বিভাগীয় শহরে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, খুলনা ২০২০'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা, গবেষণা, সেবার মনোন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণই এই আইন প্রণয়নের লক্ষ্য। এই আইনে মোট ৫৫টি ধারা এবং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও সংবিধি প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে জুলাই ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয়ে সাশ্রয়ের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন। সভায় প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয়ে সাশ্রয়ী হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিরা সবাই ঘরে ঘরে বা বাড়ির সামনে একটি করে সেতু চান। এতে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দুই দিক থেকেই ক্ষতি হয়। তাই এখন থেকে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে ভালোভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

একনেকে ৮ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই একনেক সভায় ৮টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ হবে ১০ হাজার ১০২ কোটি টাকা। অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হলো– সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাথ নির্মাণ (দ্বিতীয় সংশোধিত) প্রকল্প, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুন ১৮টি ওয়ার্ডে সড়ক অবকাঠোমা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন ফেজ-১, তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। এছাড়া রয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রংপুর(জোন) প্রথম সংশোধিত প্রকল্প।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ, ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে মানুষ যেন ঠিকভাবে জানতে পারে এবং একইসঙ্গে এসময় যারা কর্মে নিয়োজিত, তারা যাতে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেজন্য এ পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৭ই জুলাই সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব পরিচালনা পর্ষদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে গণমাধ্যমের প্রতি অনুরোধ ছিল তারা যেন গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে ও গণমাধ্যম যাতে চালু থাকে এবং আমরা দেখছি, সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গণমাধ্যম চালু আছে। তবে অনেক সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে করোনা এবং করোনা উপসর্গে মৃত্যুবরণকারী সাংবাদিকদের প্রত্যেক পরিবারকে ৩ লাখ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ৬টি পরিবারকে এ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে করোনাকালে অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক ইউনিয়ন, প্রেসক্লাব ও ডিসি অফিস এ কাজে সহায়তা করছে।

এসময় প্রেসক্লাব সভাপতি সাইফুল আলমের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রেসক্লাবের মূল আয় হলো মিলনায়তন ভাড়া। বন্ধ থাকার কারণে প্রেসক্লাব কিছুটা আর্থিক সংকটে পড়েছে। এ বিষয়ে আরো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ এখন কোন পর্যায়ে সেটি বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সমস্ত কিছু যখন আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে, প্রেসক্লাবও সেক্ষেত্রে সীমিত আকারে খুলে দেবার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

এসময় সংবাদপত্রগুলোর বিক্রি ও ছাপার সংখ্যা দু'টিই কমেছে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ অবস্থা লক্ষ করেই আমি নিজে অনুরোধ করে মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, যাতে তারা সংবাদপত্রের বকেয়াগুলো পরিশোধ করে। এতে অনেকটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং প্রয়োজনে আবার তাগিদ দেওয়া হবে। বকেয়া বিলগুলো পেলে সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়া সহজ হয়, সেজন্যই এ পদক্ষেপ।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৭শে জুলাই ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকারকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৯-২০২০ প্রদান করেন। তথ্য সচিব কামরুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

নিয়ম-নীতি ও করের আওতায় আনা হবে বিদেশি সামাজিক মাধ্যম ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে

বিদেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট ও বিজ্ঞাপন প্রচারসহ সামগ্রিক বিষয়টিকে যুগোপযোগী নিয়ম-নীতি ও করের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৫ই জুলাই সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার শুরুতে এসব কথা জানান তিনি। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. নূর-উর-রহমান, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মো. জহুরুল হক প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওভার দ্য টপ (ওটিটি) প্ল্যাটফর্ম বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিও-ভিডিওসহ নানা কনটেন্ট প্রচার বর্তমান যুগের একটি ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র পৃথিবীতে এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিনোদন থেকে শুরু করে নানা কনটেন্ট সেখানে স্ট্রিমিং করা হচ্ছে, আমাদের দেশেও হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি, এ নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে, সেন্সরবিহীন কনটেন্ট প্রদর্শিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকার ঠিকভাবে কর পাচ্ছে না।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ওটিটি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে। ফলে এসব মাধ্যম ব্যবহার করে সমাজ বিনির্মাণের যেমন সুযোগ আছে, সমাজকে অস্থিতিশীল করারও সুযোগ থাকে। আমরা সময়ে সময়ে দেখতে পাচ্ছি এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব রটানো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে যুবা ও কিশোরদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তৈরি হয়েছে। এটি একটি বাস্তবতা। এই মাধ্যমগুলো আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ঠিকভাবে।

২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের দেশে এবং সারা পৃথিবীতেই এ নতুন বাস্তবতা মূল্যবোধ ও আইনগত নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ফলে যে বিষয়গুলোর সাথে আমরা আগে সংযুক্ত ছিলাম না, সেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র এবং এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাবসার সুযোগ রয়েছে, যা অবশ্যই করযোগ্য। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেমন নেটফ্লিক্স, ইউটিউব প্রভৃতির কাছে দেশের অনেক অর্থ চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেখান থেকে সরকার যেভাবে কর পাওয়ার কথা তা পাচ্ছে না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শুরুতে এরকমই অবস্থা ছিল, কিন্তু অনেক দেশে নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন ভারতে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অন্য দেশের কনটেন্ট দেখানোর ক্ষেত্রে নানা আইন-কানুন, নিয়ম-নীতির প্রবর্তন হয়েছে। ভারতে চালু থাকার জন্য ফেইসবুক ভারতীয় কোম্পানি হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়েছে। আমাদের দেশে এখনো রেজিস্টার্ড হয়নি, তবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় তারা একজন এজেন্ট নিয়োগ করেছে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট ও বিজ্ঞাপন প্রচারসহ সামগ্রিক বিষয়টিকে যুগোপযোগী নিয়ম-নীতি ও করের আওতায় আনার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)-কে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়, যার অপর চার সদস্য হিসেবে রয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন করে প্রতিনিধি ও একজন আইন বিশেষজ্ঞ।

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেন, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত; এর যে-কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটিও অক্ষত থাকতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার একদিকে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিরন্তর কাজ করছে অন্যদিকে গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করতেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১১ই জুলাই জামালপুর প্রেসক্লাবের দ্বিতল ভবন কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম উন্নয়ন ও অগ্রগতির রূপরেখা অঙ্কন করে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নে যেমন সহায়তা করে তেমনি সরকারের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে এবং যে-কোনো সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ জন্য গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে জুলাই ২০২০ গণভবন লেকে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২০ এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত

১লা জুলাই: শততম বর্ষে পদার্পণ করল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য এবছর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস'।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০

৪ঠা জুলাই: শত বছরের মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপারসন করে 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল' গঠন করেছে সরকার।

একনেকে ৯টি প্রকল্পের অনুমোদন

৬ই জুলাই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেরেবাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় ৯টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী।

ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা আইন পাস

৮ই জুলাই: একাদশ জাতীয় সংসদের বাজেট (অষ্টম) অধিবেশনে ব্যতিক্রমী ভার্চুয়াল আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বিল-২০২০ পাস হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

১১ই জুলাই: করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংকটময় পরিস্থিতির কারণে এবছর 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' উপলক্ষে বড়ো ধরনের কোনো কর্মসূচি পালন করা হয়নি। তবে অনলাইনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'মহামারি কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ করি, নারী ও কিশোরীর সুস্বাস্থ্যর অধিকার নিশ্চিত করি'।

শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া অনুমোদন

১৩ই জুলাই: গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী সব বিভাগীয় শহরে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, খুলনা ২০২০'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন। এই আইনের মোট ৫৫টি ধারা এবং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও সংবিধি প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে।

৮টি প্রকল্পের অনুমোদন

১৪ই জুলাই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই একনেক সভায় ৮টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন খরচ হবে ১০ হাজার ১০২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাক্টের খসড়া নীতিগত অনুমোদন

১৬ই জুলাই: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভাকক্ষে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের বয়স বাড়িয়ে ৬৭ বছর করার প্রস্তাব সংক্রান্ত 'দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২০'- এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশে ১ কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০-এর প্রতিপাদ্য ছিল– 'মুজিববর্ষের আহ্বান, লাগাই গাছ বাড়াই বন'।

দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

২১-২৭শে জুলাই: সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০' উদ্‌যাপিত হয়। মৎস্য সপ্তাহের এবারের স্লোগান ছিল-'মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি'।

একনেকে ৬ প্রকল্পের অনুমোদন

২২শে জুলাই: প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারম্যান শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় প্রায় ১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৪ টাকা খরচে ৬টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে সরকার দেবে ১ হাজার ২৮ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং বিদেশি ঋণ ও অনুদান ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

জনপ্রশাসন পদক প্রদান

২৩শে জুলাই: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জন প্রশাসন পদক-২০২০ প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে ৪৫ জন ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে পদক দেওয়া হয়।

বিশ্ব বাঘ দিবস

২৯শে জুলাই: বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে এবছর বিশ্ব বাঘ দিবসের অনুষ্ঠান হয়নি। তবে ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হয় দিবসটি। এবারের বিশ্ব বাঘ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে–'বাঘ বাড়াতে করি পণ, রক্ষা করি সুন্দরবন'।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

২১০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা হতে পারে ৮৮০ কোটি

বিশ্বের জনসংখ্যা ২১০০ সালে ৮৮০ কোটিতে (৮.৮ বিলিয়ন) উন্নীত হতে পারে। এটি জাতিসংঘের অনুমানের চেয়ে প্রায় ২০০ কোটি কম। ১৬ই জুলাই ২০২০ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ আভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশিত এই নিবন্ধে গবেষকরা বলেন, জনসংখ্যার স্তর ধরে রাখতে যে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, সেটি চলতি শতক শেষ

হওয়ার আগে ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১৮৩টি দেশেই নেমে যাবে। জাপান, স্পেন, ইতালি, থাইল্যান্ড, পর্তুগাল, দক্ষিণ কোরিয়া, পোল্যান্ডসহ ২০টি বেশি দেশ এই সময়ে নিজেদের জনসংখ্যা অন্তত অর্ধেক কমে যেতে দেখবে। চীনের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৪০ কোটিতে (১.৪ বিলিয়ন) ঠেকতে পারে।

সাব-সাহারা আফ্রিকায় জনসংখ্যা তিন গুণ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৩০০ কোটিতে (৩ বিলিয়ন)। এর মধ্যে শুধু নাইজেরিয়ায় ২১০০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হতে পারে ৮০ কোটি; যা হবে ভারতের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ভারতে এই সময়ে জনসংখ্যা দাঁড়াতে পারে ১১০ কোটিতে (১.১ বিলিয়ন)।

গবেষণায় বলা হয়, বেশি আয়ের দেশগুলোর জন্য জনসংখ্যার স্তর ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার সবচেয়ে উত্তম সমাধান হবে, নমনীয় অভিবাসীর নীতি গ্রহণ করা এবং যেসব পরিবার সন্তান নিতে চায়, তাদের সামাজিক সমর্থন দেওয়া।

গরিবদের সহায়তায় ১,০৩০ কোটি ডলারের আবেদন জাতিসংঘের

করোনা ভাইরাস মহামারি ও এর প্রভাব মোকাবিলার জন্য গরিব দেশগুলোকে সহায়তার জন্য ধনী দেশগুলোর কাছে ১ হাজার ৩০ কোটি মার্কিন ডলার তহবিল সহায়তা চেয়েছে জাতিসংঘ। এটি বিশ্ব সংস্থাটির সবচেয়ে বড়ো অর্থ তহবিলের আবেদন। ১৬ই জুলাই জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক লোকক এই আবেদন জানান।

জাতিসংঘ জানায়, করোনার প্রভাবে চলতি বছরের শেষ নাগাদ সাড়ে ২৬ কোটির বেশি মানুষ অনাহারের ঝুঁকিতে থাকবে। সেই কারণেই এই অর্থ নিম্ন ও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশগুলোর মানুষের সহায়তায় ব্যবহার করা হবে।

মার্ক লোকক সতর্ক করেছেন, মহামারির মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে দশকের পর দশক ধরে যে উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে, তা আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। মার্চে সংস্থাটি প্রথমে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার তহবিল চেয়েছিল। কিন্তু এখন তারা রেকর্ড পরিমাণ তহবিল চাচ্ছেন, এই কারণে যে মহামারির মারাত্মক প্রভাব গরিব দেশগুলোতে পড়তে শুরু করেছে।

জাতিসংঘ বলছে, ধনী দেশগুলো নিজেদের অর্থনীতি সুরক্ষা করতে আর্থিক নিয়মনীতির বেড়াজাল থেকে সরে এসেছে। এখন গরিব দেশগুলোর জন্যও একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা করা না গেলে বিশ্ব একাধিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে, লাখ লাখ মানুষকে অনাহারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

লকডাউনের কারণে বিশ্বের লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। ফলে তাঁরা বাড়িতে অর্থও পাঠাতে পারছেন না। শিশুদের জন্য টিকাদান কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলোতে অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় ধস নেমেছে। এছাড়া যেসব দেশে বছরের পর বছর সংঘাত চলছে, সেখানে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। দেশটির সন্দেহভাজন করোনা রোগীর চারজনের একজন মারা যাচ্ছেন, যা মৃত্যুতে বৈশ্বিক গড়ের পাঁচ গুণ বেশি।

করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি, তা নিয়ে অনেক সংগঠন আগেই সতর্ক করেছে। গরিবদের সহায়তার জন্য অক্সফাম, খ্রিষ্টান অ্যাড, ইসলামিক রিলিফের মতো ১৪টি দাতব্য সংস্থা একসঙ্গে আর্থিক অনুদানের জন্য ব্রিটিশ নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

১৮ বছর বয়সি নাগরিকরাও জাতীয় পরিচয়পত্র পাবে

এবারে জাতীয় পরিচয়পত্র পাচ্ছেন ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি নাগরিকরাও। বিনামূল্যে নির্বাচন কমিশনের সার্ভার থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র ডাউনলোড করতে পারবেন তারা। তবে ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগও করতে পারবেন না। ১৪ই জুলাই নির্বাচন কমিশনের আইডিয়া প্রজেক্টের অফিসার ইনচার্জ (কমিউনিকেশন) স্কোয়াড্রন লিডার কাজী আশিকুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবার ধারাবাহিকতায় ১৮ বছরের বেশি বয়সের নাগরিকদের পাশাপাশি ভোটার তালিকা হালনাগাদ-২০১৯ কার্যক্রমে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি নিবন্ধিত নাগরিকরাও জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে পারবেন।

হালনাগাদের সময় ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি যে সকল নাগরিক বিভিন্ন সময় নির্বাচন অফিসে এসে নিবন্ধিত হয়েছেন তারাও অনলাইনে এনআইডি কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া

অনলাইনে আবেদন করে বায়োমেট্রিক প্রদান করে যারা নতুন নিবন্ধন হবেন তারা সবাই জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে পারবেন।

নিবন্ধিত ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি নাগরিকরা নির্বাচন কমিশনের এনআইডি ওয়েব পোর্টাল https://services.nidw.gov.bd-এ অন্যান্য তথ্য ক্যাপশনের এনআইডি নম্বর লিংকে ব্যক্তির ফরম নম্বর ও জন্ম তারিখ দিয়ে এনআইডি নম্বর গ্রহণ করবেন। পরে ওই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করে নিজের প্রোফাইল দেখতে পাবেন এবং ডাউনলোড অপশন থেকে বিনামূল্যে জাতীয় পরিচয়পত্রের রঙিন কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে এ পোর্টাল হতে নিবন্ধিত ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি নাগরিকরা শুধুমাত্র একবারই তার জাতীয় পরিচয়পত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। ওই জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণ ও লেমিনেটিং করে সকল প্রকার নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

নগদ সুপারিশ ২৬টি পণ্যে

করোনা সংকটে দেশের রপ্তানি খাতকে সহায়তার জন্য নতুন ২০টিসহ মোট ২৬ ধরনের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ৫ থেকে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়ার সুপারিশ চূড়ান্ত করে নোটশিট জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ট্যারিফ কমিশনের কাছ থেকে নগদ সহায়তার জন্য পণ্যের তালিকা পাওয়ার পর সেটি যাচাই-বাছাই শেষে ২৬টি পণ্যকে নগদ সহায়তার জন্য চূড়ান্ত করে তৈরিকৃত নোটশিটে অনুমোদন দেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। করোনা সংকটে বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে দেশের রপ্তানি খাতের সম্প্রসারণে যে পণ্যগুলো ভূমিকা রাখবে মূলত সে ধরনের পণ্যগুলোকেই নগদ সহায়তার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। যেসব খাত সুপারিশ পেল– পিপিই, মাস্ক, স্যানিটাইজার, ভেন্টিলেটর, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গ্লাভস ইত্যাদি রপ্তানিতে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল, প্লাস্টিকের খেলনা, লাইভ ফিশ (কাঁকড়া ও কুঁচে) রপ্তানির বিপরীতেও সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তার সুপারিশ করা হয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ইনোভেশন সামিট অনুষ্ঠিত

দেশে প্রথমবারের মতো অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ ইনোভেশন সামিট-২০২০'। ১০ই জুলাই শুরু হয়ে টানা দুই দিনের এ সম্মেলন শেষ হয় ১১ই জুলাই। সামিটের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আজকের উদ্ভাবন, আগামীর সম্ভাবনা'। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। দুই দিনের এ সম্মেলনে ১৭টি সেশনে ৩৩ জন বক্তা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান বৈশ্বিক মহামারির কারণে নতুন উদ্ভাবন এবং কর্মপরিকল্পনাকে মূল বিষয়বস্তু রেখে এবারের 'বাংলাদেশ ইনোভেশন সামিট-২০২০' সাজানো হয়। প্রথমদিনের ভার্চুয়াল সম্মেলনে ৭টি সেশনে অংশ নেয় মোট ৫০ হাজার জন। আয়োজনের প্রথমদিন ছিল বিজনেস সামিট এবং দ্বিতীয় দিনে আইটি প্রফেশনালস মিট-আপ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'করোনার এ সময়ে এবং এর পরবর্তী তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরতা আরো বাড়বে। ডিজিটাল কানেক্টিভিটির সহজলভ্যতার কারণে এখন যে কেউ যে–কোনো প্রান্ত থেকে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারবেন। যত উদ্ভাবন চর্চা হবে তার সুফল মানুষই ভোগ করবে, তাই উদ্ভাবনের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে'। তিনি আরো বলেন, আমরা তরুণদের একদিকে যেমন প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করছি অপরদিকে গবেষণায় তারা যেন উৎসাহ পায় ও সুযোগ পায় তারজন্য আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে গবেষণা ল্যাব তৈরি করেছি। বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম ২০১৬ সালে যাত্রার শুরু থেকেই দেশে উদ্ভাবনী চিন্তা এবং কাজের প্রসারের ক্ষেত্রে কাজ

করে আসছে। ফোরাম থেকে গৃহীত নানা উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে মহাকাশ বিজ্ঞান, সিস্টেম এডুকেশন, রোবটিক্স ও এআইসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কাজ চলছে।

কল সেন্টার ও আউটসোর্সিংয়ে বিনা জামানতে ঋণ

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের (বাক্কো) সদস্যদের বিনা জামানতে ঋণ দেবে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড। ১২ই জুলাই এক অনলাইন অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেয় বাক্কো ও আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড। 'বাক্কো-আইপিডিসি কোলাবোরেশন' শীর্ষক ওই অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাক্কো। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন নীতি ও প্রণোদনার সুফল পাচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। করোনার সময় আইপিডিসির বিনা জামানতে ঋণ সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করবে।

প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন দিয়েই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, প্রযুক্তিনির্ভর স্থানীয় উদ্ভাবন দিয়ে প্রাণঘাতী করোনাকালের মতোই পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। এজন্য এন্টারপ্রেনিঅর ইকোসিস্টেম বা উদ্যোক্তা সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং ধনী-গরিব, শহর-গ্রামের বৈষম্য ঘুচাতে আইসিটি বিভাগ নিরন্তর কাজ করছে। প্রতিমন্ত্রী ১৪ই জুলাই বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক, বেটার স্টোরিজ, ইউএস মার্কেট এক্সেসেস-এর উদ্যোগে 'কোভিড এক্সিলারেটরের প্রথম পর্বের গ্রাজুয়েশন' প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত ওয়েবিনারে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনাতেও এগিয়ে চলেছে রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প

করোনা ভাইরাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি মেগাপ্রকল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হলেও দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ৩০ শতাংশ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। ২০২৩ সালে প্রকল্পটি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্প থেকে সময়মতো বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে আট হাজারের মতো জনবল এ প্রকল্পের কাজ করছে। যার মধ্যে বিদেশি জনবল রয়েছে প্রায় দুই হাজার।

প্রকল্প পরিচালকের মতে, 'এক লাখ কোটি টাকার বেশি ব্যবহারে এ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে বিদেশি জনবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কাজের গতি আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে। রিঅ্যাক্টর ভবনের নির্মাণের কাজ এগিয়ে আছে। নির্মাণকাজের ৩০ শতাংশের পাশাপাশি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ২৭ শতাংশ। সরকার আশা করছে, ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে দেওয়া সম্ভব হবে। পরের বছর চালু হবে সমান ক্ষমতার দ্বিতীয় ইউনিট।

পণ্যের দাম পরিশোধ স্মার্টফোনেই

অনলাইন কেনাকাটা আরো সহজ করে তুলতে 'ক্যাশলেস পে' (নগদ অর্থবিহীন লেনদেন) নিয়ে এসেছে হোম ডেলিভারি

CashlessPay

নেটওয়ার্ক পেপারফ্লাই। ১২ই জুলাই মাস্টারকার্ড ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের (ইবিএল) সঙ্গে অংশীদারীর মাধ্যমে পেপারফ্লাই ডিজিটাল পেমেন্ট অন ডেলিভারি সলিউশন– 'ক্যাশলেস পে' উদ্‌বোধন করে।

যেসব ক্রেতা অনলাইনে অর্ডার দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে পণ্য নিজেদের দোরগোড়ায় পেতে চান তারা পেপারফ্লাইয়ের নতুন এই ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে এখন থেকে পণ্য গ্রহণের সময় নগদে মূল্য পরিশোধের (ক্যাশ অন ডেলিভারি–সিওডি) পরিবর্তে ডিজিটাল উপায়ে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। সারা দেশেই মিলবে এই সেবা।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

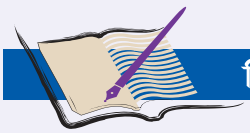

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : শতবর্ষে পদার্পণ

শিক্ষা ও গবেষণার গুণগতমান নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ১লা জুলাই ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:

প্রসঙ্গ: আন্দোলন ও সংগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটি এবছর শতবর্ষে পদার্পণ করল। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সীমিত আয়োজনে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে উপাচার্য বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার বিস্তার, মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন ও মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৫৭ জন শিক্ষার্থী এবং ৩টি আবাসিক হল নিয়ে যাত্রা শুরু হয় প্রতিষ্ঠানটির। বর্তমানে ১৩টি অনুষদ, ১৩টি ইনস্টিটিউট, ৮৪টি বিভাগ, ৬০টি ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র এবং ছাত্রছাত্রীদের ১৯টি আবাসিক হল, ৪টি হোস্টেল ও ১৩৮টি উপাদানকল্পে কলেজ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৬,১৫০ জন এবং পাঠদান ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে ২০০৮ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের সব আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, বরং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমাবদ্ধতা না রাখার নির্দেশ

বর্তমান সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিদেশ ফেরত দক্ষ কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো রকমের বয়সের সীমাবদ্ধতা না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমণি। ১লা জুলাই কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত ভার্চুয়াল মিটিং-এ নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেক ব্যক্তির হয়ত প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা আছে কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সার্টিফিকেট নেই এবং সার্টিফিকেট না থাকার কারণে ভালো চাকরি পাচ্ছে না অথবা চাকরি পেলেও ভালো বেতন পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যদি চায় এবং যদি তার প্রয়োজনীয় একাডেমিক যোগ্যতা থাকে তাহলে সে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া তিনি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেদের ন্যূনতম যোগ্যতা জিপিএ ৩.৫ থেকে কমিয়ে ২.৫, মেয়েদের ক্ষেত্রে জিপিএ ৩ থেকে কমিয়ে ২.২৫ করার এবং কোর্সের ভর্তি ফি ১,৮২৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১,০৯০ টাকা করার সিদ্ধান্ত দেন।

কারিগরি, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমণি ১৬ই জুলাই 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০' উপলক্ষে ড্যাফোডিল পরিবার ও এটুআই-এর যৌথ আয়োজনে 'কোভিড-১৯ ও এর পরবর্তী সময়ের প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কি প্রস্তুত' শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার গতানুগতিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, দেশে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষার সব ধারারই কিছু আবশ্যিক দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তাই সরকার আবশ্যিক দক্ষতা নিশ্চিত ও যাচাইয়ের জন্য একটি ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবেদনঃ মো. সেলিম

বিনিয়োগঃ বিশেষ প্রতিবেদন

গবেষণা ও উন্নয়নে ৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে অপো

বাংলাদেশের বাজার নিয়ে অপোর আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা বিষয়ে অপো বাংলাদেশ এইডি'র পরিচালক ড্যামন ইয়াং ৪ঠা জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগই তরুণ। সাধ্যের মধ্যে সাশ্রয়ী দামের স্মার্টফোন তুলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে থাকা সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চাই আমরা। ফাইভজি'র উন্নয়নেও বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে

অপো বাংলাদেশ এইডি'র পরিচালক ড্যামন ইয়াং

অপো। এর মধ্যে আছে 'গ্র্যাভিটি প্ল্যান ২.০' নামে একটি সাপোর্ট প্রোগ্রাম– যা ডেভেলপার ও পার্টনারদের সঙ্গে নিয়ে চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফাইভ সিস্টেম-লেভেল ক্যাপাবিলিটি এক্সপোজার ইঞ্জিনস এবং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'আইওটি অ্যানাবলমেন্ট প্ল্যান' হাতে নিয়েছে অপো। আগামী তিন বছরে গবেষণা ও উন্নয়নে (আরঅ্যান্ডডি) ৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে অপো। ফাইভজি, এআই, এআর, বিগ ডাটাসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং সিস্টেমের উন্নয়নে এই বিনিয়োগ কাজে লাগানো হবে। আরঅ্যান্ডডি থেকে প্রাপ্ত কিছু উদ্ভাবন এরই মধ্যে দেখা গেছে অপোর ফাইন্ড সিরিজ, রেনো সিরিজ, এফ সিরিজ এবং এ সিরিজের স্মার্টফোনে। বাংলাদেশ সরকার আগামী বছরের মধ্যে দেশে ফাইভজি নিয়ে আসতে কাজ করছে এবং আমরা বিশ্বাস করি অপো এই অগ্রযাত্রায় সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারবে।

স্মার্টফোন বাজার নিয়ে তিনি আরো বলেন, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের স্মার্টফোন বাজারে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং দেশে ফোরজি চালুর কারণে স্মার্টফোন শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। ই-কমার্স, রাইড শেয়ারিং, অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের গ্রাহক বৃদ্ধির কারণে সাশ্রয়ী দামের স্মার্টফোনের চাহিদাও বাড়ছে। স্মার্টফোনের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় উৎসাহিত হয়ে আমরা এখানে সংযোজন কারখানাও স্থাপন করেছি। এর ফলে আমাদের স্মার্টফোন উৎপাদন খরচও কমেছে এবং আমরা দেশের মানুষের হাতে সাশ্রয়ী দামে স্মার্টফোন তুলে দিতে পারছি। এছাড়াও কারখানা স্থাপনের ফলে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন হয়েছে, তেমনি সরকারি কোষাগারেও অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে বাজারের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সরকারও মোবাইল ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করছে। গ্রাহকদের বিভিন্ন অনুসন্ধানের তথ্য প্রদানে অপো অনলাইন সার্ভিস টিম নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য আমরা বর্ধিত ওয়ারেন্টি প্রদান করেছি।

প্রতিবেদন : এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী হাইকমিশনার নাহিদা রহমান

কূটনৈতিক নাহিদা রহমান সুমনাকে ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ খবর নিশ্চিত করেছে। বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারের ১৭তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক সংস্থা অনুবিভাগের মহাপরিচালক।

নাহিদা রহমান এর আগে কনস্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে ছিলেন ব্রাসিলিয়ায়। ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিজারুল কায়েস মারা গেলে সুমনা মিশনে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্ব পালন করেন। এরও আগে তিনি অটোয়া, কলকাতা ও ক্যানবেরা মিশনে বিভিন্ন পদে কাজ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী সুমনা পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্স-বাউন্ডারি ওয়াটার 'ল বিষয়ে পড়াশোনায় ফেলোশিপও পেয়েছেন নাহিদা রহমান সুমনা।

করোনার জিন নকশা উন্মোচনে সেঁজুতি সাহা

দেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম জিন নকশা উন্মোচন করেছে অণুজীববিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা ও তার দল। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা শিশু হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক সমীর সাহা এ খবর নিশ্চিত করেছেন। করোনা ভাইরাসের জিন নকশা উন্মোচনের (জিনোম সিকোয়েন্সিং) কাজটি দেশে বড়ো ধরনের একটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছে সরকারের করোনা বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি। কোভিড-১৯ এর জিন নকশা উন্মোচনের ফলে এদেশের পরিবর্তনশীল করোনা ভাইরাসের প্রকৃতি এবং সংক্রমণ কৌশল সম্পর্কে জানা যাবে।

অণুজীববিজ্ঞানী ডা. সেঁজুতি সাহা বর্তমানে বাংলাদেশের শিশু বিষয়ক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনে কর্মরত। তিনি তার বাবা সমীর সাহার সঙ্গে রোগ নির্ণয় জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেন।

সাইবার সুরক্ষায় রেজওয়ানা

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে লকডাউনে অনেকেই ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করছেন। আর এ সুযোগটাই নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা। তাদের প্রধান লক্ষ্য হতে পারে নারীরা। প্রতিষ্ঠান পর্যায়েও হতে পরে বড়ো ধরনের সাইবার আক্রমণ। এজন্য প্রয়োজন যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সচেতনতা। এ দুটি বিষয় নিয়েই বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার খাতের উদ্যোক্তা রেজওয়ানা খান।

স্টার কম্পিউটার সিস্টেমস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সাইবার খাতে সচেতনতার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিরাপত্তার জন্য ডিভাইস ও সেবা চালু করেছেন তিনি। যে কেউ সেখান থেকে সেবা নিতে পারবেন। মেয়ে ও নারীদের ডিভাইস এবং অনলাইন অ্যাকাউন্টগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। নারীরা অনলাইনে নিপীড়ন ও হ্যাকিংয়ের শিকারও হয় বেশি। অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সচেতনতা না থাকা ও নিরাপত্তা কৌশলগুলো প্রয়োগের অভাবে তারা বিপদে পড়েন। এসব চিন্তা থেকেই তিনি এ সেবা কার্যক্রম চালু করেছেন। দেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠানেও সফটওয়্যারসহ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেবা দেন রেজওয়ানা।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনায় সরকারি ত্রাণ পেয়েছে এক কোটি ৬৮ লাখ পরিবার

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে দেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারা দেশে দেড় কোটির বেশি

পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ৪ঠা জুলাই সরকারি তথ্য বিবরণী থেকে এ তথ্য জানা যায়।

৬৪ জেলার জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীর ৩রা জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই লাখ ১১ হাজার ১৭ টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ১২০ টন। এতে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা এক কোটি ৬৮ লাখ ৩০

হাজার ১৮ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৩৮ লাখ ৪ হাজার ৭৯৫ জন।

শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রায় ১২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৯৫ কোটি ৮৩ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৯৩ কোটি ৯২ লাখ ৪ হাজার ১৬ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা এক কোটি ১৬ হাজার ৫২৯ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা চার কোটি ৪২ লাখ ৩৪ হাজার ৫৮৫ জন।

এছাড়া শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৬ কোটি ৪০ লাখ ১৯ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা আট লাখ ৪২ হাজার ৫৪৭ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৭ লাখ ৫৮ হাজার ৪৩৪ জন বলেও তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন

বর্তমান সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বের পরিবেশ, মানুষের জীবন ও জীববৈচিত্র্য চরম হুমকির সম্মুখীন। মানুষের জীবিকাও হুমকির সম্মুখীন, সেজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হলে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। সেলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতিটি ইউনিয়নে ও উপজেলায় ১০০টি করে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৭ই জুলাই কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক তার সরকারি বাসভবন থেকে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধনের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে, ইউনিয়নে ও উপজেলায়-জেলায় দেশীয় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগাতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ উদ্যোগের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল জনগণকে গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ করা হবে। পরে কৃষিমন্ত্রী তার বাসভবন চত্বরে একটি কাজু বাদামের চারা রোপণ করে এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রথম ধাপে প্রত্যেক উপজেলায় ১০০টি করে সারা দেশে প্রায় ৫০ হাজার বৃক্ষরোপণ করবে। দ্বিতীয় ধাপে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে আরো ১০০টি করে বৃক্ষরোপণ করা হবে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ফলদ, বনজ ও ঔষধির পাশাপাশি মশলা জাতীয় গাছ লাগানো হবে।

করোনার সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে সরকার

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৭ই জুলাই ২০২০ রাজধানীর হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। করোনার দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষি খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভরতুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। ৫ই জুলাই তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স (অ্যামচ্যাম) বাংলাদেশ আয়োজিত কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সহায়তা কার্যক্রম অনলাইনে উদ্‌বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরো অনেক বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে, যাতে করে দেশে খাদ্যের কোনো ঘাটতি না হয়, খাদ্য আমদানি করতে না হয়। বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য খাদ্য সংকটে আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ যাতে তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও পাট বীজ কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আমন ও রবি মৌসুমে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদ্যুৎ উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ

দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫০ মেগাওয়াট সৌর এবং বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে চীন এবং বাংলাদেশ একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠনের চুক্তি করেছে। পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে এ প্রকল্পে। সরাসরি বিনিয়োগ পদ্ধতিতে চীন থেকে এই অর্থ আনা হবে।

১৪ই জুলাই অনলাইন চুক্তিটি করতে ঢাকা এবং বেইজিং সংযুক্ত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (এনডব্লিউপিজিসিএল) এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (বিসিপিসিএল) রিনিউঅ্যাবল হবে নতুন এই কোম্পানির নাম।

বেইজিং থেকে সিএমসির চেয়ারম্যান রুয়ান গুয়াং এবং ঢাকা থেকে এনডব্লিউপিজিসিএলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) প্রকৌশলী এ.এম. খোরশেদুল আলম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় রুয়ান গুয়াং বলেন, বাংলাদেশের পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো প্রযুক্তি এবং দক্ষকর্মী বাহিনী নিয়ে পাশে থাকবে সিএমসি। বাংলাদেশের সঙ্গে সুদীর্ঘ ৩০ বছরের পথ চলার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা বাংলাদেশের সব সময় সহযোগিতা করতে চাই। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিং পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর মধ্য দিয়ে ঢাকা বেইজিং'র সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (বিসিপিসিএল) পায়রাতে দুটি এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে।

ইতোমধ্যে একটি কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে। প্রকৌশলী এ. এম. খোরশেদুল আলম অনুষ্ঠানে বলেন, সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং সুইডেন শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সরকারও চাইছে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে। তিনি বলেন, আমরা ৫০০ মেগাওয়াটের যে কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি সেখানে সিরাজগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট, পাবনার সুজানগরে ৬০ মেগাওয়াট এবং বেড়াতে ১০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালীর পায়রাতে ৫০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

এখন দেশে ২৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। সেই হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা দুই হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। কিন্তু সেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র ৩৬০ মেগাওয়াট। অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতির বক্তৃতায় বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, কৃষির জমির অপ্রতুলতার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে বড়ো আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যাচ্ছে না। ছাদে সৌর বিদ্যুৎ এবং ভাসমান সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বিভিন্ন উৎস হতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই জুলাই ২০২০ গণভবনে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

মন ভালো রাখবে গাছ

সবাইকে গাছ লাগনোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গাছ লাগালে মনও ভালো রাখবে, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনবে, নিজের গাছের একটি ফল বা কাঁচা মরিচ খেলেও ভালো লাগে। ১৬ই জুলাই গণভবন চত্বরে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২০-এর উদ্‌বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন, তিনি সেখানে তেঁতুল, ছাতিয়ান এবং চালতা এই তিনটি গাছের চারা রোপণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রথমবার ১৯৯৬ সালে যখন ক্ষমতায় আসি তখন দেশে বনভূমির পরিমাণ ছিল মাত্র সাত শতাংশ যা আজকে আমরা ১৭ শতাংশে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য সারা দেশে ২৫ শতাংশ বনায়ন করব, সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি, তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন রক্ষা করার দরকার তেমনি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির দরকার। সে কারণে আমাদের এই বৃক্ষরোপণ করাটা অত্যন্ত দরকার। আমি শুরু থেকেই সিদ্ধান্ত দিয়েছি প্রত্যেককে একটি ফলদ, একটি বনজ ও একটি ভেষজ– এই তিনটি করে গাছ লাগাতে হবে। কাজেই আজকে আমি লাগিয়েছি একটি তেঁতুল গাছ, একটি চালতা গাছ এবং একটি ছাতিয়ান গাছ।

পরিবেশ রক্ষায় সরকারের কর্মপরিকল্পনা

চলতি বর্ষা মৌসুমে ৫০ লাখ চারা রোপণ করবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)। পরিবেশ রক্ষায় সরকারের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৫ই জুলাই চট্টগ্রামের

মিউনিসিপ্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরেপাণ কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। মেয়র বলেন, সবুজ ও পরিবেশ ঘাতকরা করোনার চেয়ে ভয়ংকর ভাইরাস।

তিনি আরো বলেন, সবুজ উদ্ভিদজগৎ মানবকুলসহ জীব-প্রাণীর বেঁচে থাকার অবলম্বন। এ সবুজ প্রাণ– প্রকৃতি জগতের ভারসাম্য রক্ষা করে। সবুজ উদ্ভিদের প্রতি অশেষ ঋণ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা অনুধাবন করছি না, লাগামহীন সবুজ উদ্ভিদ নিধনের ফলে অক্সিজেন শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের নির্দয় ও অবিবেচক আচরণের ফলেই আমরা আজ করোনাকালে দুর্যোগের ঘনঘটায় বিপর্যস্ত। এ সময় মেয়র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫শ' চারাগাছ বিতরণ করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট শ. ম রেজাউল করিম (এমপি) মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৩ই জুলাই পিরোজপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে ১০ হাজার ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন তিনি। বৈশ্বিক মহামারি করোনা দুযোর্গ প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে নির্মল বায়ু ও অক্সিজেন গ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রতিবেদনঃ রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

রাজশাহীর মহানগরীর সড়কের পাশের গাছে গাছে রঙিন ফুল

রাজশাহীর মহানগরীর যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই ফুল। নগরীর রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সড়কের পাশের গাছে এখন শোভা পাচ্ছে রঙিন ফুল। সড়ক বিভাজনেও বসেছে ফুলের পসরা। নগরীর রেলগেট থেকে সিঅ্যান্ডবি মোড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার সড়ক বিভাজনে ফুল আর সবুজে ছেয়ে যাওয়া নানা প্রজাতির গাছ। তবে সেখানে ফুল গাছের সংখ্যাটি বেশি। নগরীর সড়ক বিভাজন আর তার পাশে থাকা গাছগুলোতে যেন বসেছে রঙিন ফুলের পসরা, পুরো নগরী ভরে উঠেছে ফুলে ফুলে। এতে পথচারীদের মাঝে বাড়তি ভালোলাগা কাজ করছে। এতে নগরীর সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। রঙিন বেগুনি রঙের জারুলের মতো ফুলটির নাম মনোলোভা জ্যাকরান্ডা, হলুদ রঙের ফুলটির নাম আলমান্ডা এমনি রঙিন নানা জাতের ফুল শোভা পাচ্ছে সড়কজুড়ে। প্রকৃতি যেন আপন হাতে সাজিয়েছে নিজেকে।

রাজশাহীতে আরো একটি ফ্লাইওভার

করোনা সংকট পেছনে ফেলে রাজশাহীতে আবারো শুরু হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ। পুরোদমে চলছে নগরীর কাশিয়াঙ্গা বাইপাস সড়ক সংস্কারের কাজ। প্রথম ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষের পথে। এরই মধ্যে যানজট নিরসনে নগরীর বর্ণালী মোড় থেকে বিলসিমলা পর্যন্ত আরেকটি ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা করছে রাজশাহী সিটি করপোরেশন। নগরীতে বসবাস বাড়তে থাকায় বেড়েছে যানবাহন। এতে বাড়ছে যানজট। তাই বড়ো পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক)। যানজট নিরসনে নগরীর উন্নয়নে বর্ণালী মোড় থেকে বিলসিমলা পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। রাসিকের ষষ্ঠ সাধারণ সভায় মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এ পরিকল্পনার কথা জানান। মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, যানজট নিরসনে নগরীর বর্ণালী মোড় থেকে বিলসিমলা পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনঃ মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থানঃ বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিকে ৪০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হবে

বড়ো আকারের নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নিয়োগের ব্যাপারে কাজ করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সারা দেশে প্রায় ২৬ হাজার প্রাক-প্রাথমিক ও ১৪ হাজার সহকারী মিলে মোট ৪০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। বর্তমানে চলমান মহামারি করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই আগামী সেপ্টেম্বরে এ নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হবে। গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাম আল হোসেন। ৫ই জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, বর্তমানে সারা দেশে ২৬ হাজার

শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। একইসঙ্গে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৪ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। সব মিলিয়ে একত্রে ৪০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে (ডিপিই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে নারী-পুরুষ উভয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়, যা আগে পুরুষের ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি এবং নারীদের ক্ষেত্রে এইচএসসি বা সমমান পাস ছিল। পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে এ বিষয়টি পরিবর্তন হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ।

মহাপরিচালক বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ নিয়ে কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রস্তুতি শুরু করেছি। করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে আগামীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তা সম্ভব না হলে স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা হবে।

তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। যেহেতু বিপুলসংখ্যক প্রার্থী নিয়োগের জন্য আবেদন, সে কারণে সার্বিক সবকিছু বিবেচনা করে প্রার্থীরা যাতে ঝুঁকির মুখে না পড়েন, সেসব কিছু বিবেচনা করে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আগের চেয়ে বাড়ানো হচ্ছে। নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকে স্তর অনুমোদন হওয়ায় প্রথম ধাপে ২৬ হাজার বিদ্যালয়ে একজন করে এ স্তরে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এছাড়া সারা দেশে শূন্য হওয়া বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৪ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। দুই ধাপে একইসঙ্গে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

নেগেটিভ প্রেসার আইসোলেশন ক্যানোপি উদ্ভাবন

কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা পেতে 'নেগেটিভ প্রেসার আইসোলেশন ক্যানোপি' উদ্ভাবন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) গবেষকরা। ১১ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের মাধ্যমে গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই উদ্ভাবনের কথা জানানো হয়।

কোভিড-১৯ রোগীদের থেকে নির্গত জীবাণু ও ভাইরাস হাসপাতালের অন্য রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিরাট ঝুঁকি। রোগী চারদিক ঘিরে রেখে বাতাস টেনে নিয়ে ঋণাত্মক চাপ (নেগেটিভ প্রেসার) তৈরি করে। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থা বাইরের দেশে প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশে তা ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রেই মেরামতযোগ্য নয়। বিষয়টি মাথায় রেখেই কম মূল্যের ও সহজে মেরামতযোগ্য সম্পূর্ণ নিজস্ব ডিজাইনে এই নেগেটিভ প্রেসার আইসোলেশন ক্যানোপি উদ্ভাবন

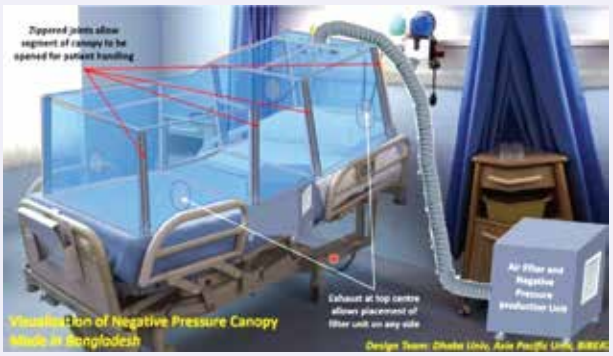

করা হয়েছে যা একটি বিছানার ওপর একজন রোগীকে আলাদা করে রাখবে। এটির চারদিকের পর্দা স্বচ্ছ ও উঁচু হওয়ায় রোগী কোনো রকম অস্বস্তিবোধ করবেন না।

সারা শরীরে ক্ষতি করে করোনা

কোভিড-১৯ শুধু ফুসফুসেরই ক্ষতি করে না। এই রোগে কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক, ত্বক, মুখগহ্বর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত পরিপাকের সঙ্গে জড়িত সব অঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএন-এর খবরে বলা হয়েছে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরভিন মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী এবং বিশ্বের আরো কয়েকটি মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগীদের রিপোর্ট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মানবদেহে কী কী ধরনের প্রভাব ফেলে তার একটি সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে নতুন এ গবেষণায়। এতে দেখা যায়, করোনা প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে। তাতে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন ধরনের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে গবেষক দল এটাও বলেছে, মুখগহ্বর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত পরিপাকের সঙ্গে জড়িত অঙ্গগুলোতে যদি উপসর্গ দেখা দেয়, তবে তা বড়ো ক্ষতির কারণ না-ও হতে পারে।

অক্টোবরেই আসতে পারে করোনার টিকা

আগামী অক্টোবর বা বছরের শেষ নাগাদ মানুষের হাতে করোনার টিকা তুলে দিতে পারবেন বলে মনে করছেন গবেষকরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, টিকা তৈরিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। অক্সফোর্ডের এ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ ওষুধ কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকার থেকে বলা হয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অক্টোবরেই টিকার সরবরাহ শুরু করা যাবে। আর এর দামও সাশ্রয়ী হবে। জার্মান জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বায়ো এন টেক ও যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ফাইজার ইন করপোরেশন বলছে, সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে চলতি বছরের শেষ নাগাদ টিকা উৎপাদনের ব্যাপারে তারা আশাবাদী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে করোনার টিকা তৈরিতে ১৬০টি উদ্যোগ সক্রিয় রয়েছে। মানবদেহে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে ২১টি টিকা। এরমধ্যে দুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে। আর ভারতের দুটিসহ ১৩৯টি আছে প্রাক-পরীক্ষামূলক পর্যায়ে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের প্রথম হেলিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে

দেশের প্রথম হেলিপোর্ট তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে বেসরকারি বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। হেলিপোর্টের জন্য উপযুক্ত স্থানও নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। এ কমিটি দ্রুততম সময়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পেশ করার পর হেলিপোর্ট তৈরির নানা বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে। ১৫ই জুলাই বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মহিবুল হক এ তথ্য জানান।

'ট্যুরিজম: এ পেনাল্টিশুট ফর দ্য ইকোনমি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক জুম কনফারেন্সে মুহিবুল হক বলেন, বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নের জন্য একটি নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। এই নীতিমালায় পর্যটনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হবে যাতে তারা তাদের অংশের কাজটুকু সঠিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। পর্যটনের উন্নয়ন ও পর্যটকদের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসকদের দৈনন্দিন কাজে পর্যটকদের সহায়তা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে। জেলা প্রশাসন যাতে পর্যটক সংগঠন হিসেবে কাজ করতে পারে– এ লক্ষ্যেই এই প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে।

পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ, গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নওয়াজীশ আলী খান, টোয়াবের সভাপতি মুহাম্মদ রাফিউজ্জামান, এভিয়েশন অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মো. মফিজুর রহমান, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশের এসপি মো. আরিফুর রহমান প্রমুখ।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে লঞ্চ–ফেরি চলাচল স্বাভাবিক থাকবে

ঈদের আগে ৫ দিন ও পরের ৩ দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও কোরবানির পশুবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান ফেরিতে পারাপার বন্ধ থাকবে। সূর্যাস্তের পর সব প্রকার মালবাহী জাহাজ, বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। ঈদের পূর্বে ৫ দিন ও পরের ৩ দিন পর্যন্ত দিনের বেলায়ও সব বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

১৫ই জুলাই নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে লঞ্চ, ফেরি ও অন্যান্য জলযান সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানরত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে সরাসরি এবং ঢাকার বাইরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে লঞ্চ ও ফেরি চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যবিধি মানতে কম্প্রোমাইজ নয়। প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ জনিত রোগ বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রণীত গাইড লাইন। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে যাত্রীসহ নৌযান চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, লঞ্চ ও ফেরিতে যাত্রী পারাপার করে আসছি। কোভিড-১৯ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় লঞ্চে কোনো যাত্রী করোনায় আক্রান্তের সংবাদ পাইনি। আল্লাহ্‌র রহমতে করোনায় মৃত্যুহার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক কম। তিনি বলেন, ঢাকা সদরঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল। এখান থেকে সারা দেশে নৌযান চলাচল করে।

নৌ প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকারের বিগত ১১ বছরে নৌপরিবহণ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নদীর প্রবাহ ঠিক রাখা, নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নকশা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

অনলাইনে সিলেট চলচ্চিত্র উৎসব

সিলেট চলচ্চিত্র উৎসবের চতুর্থ আসর ৫ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ ২০১৭ সাল থেকে নিয়মিত আয়োজন করছে এই

উৎসবের। এবছর করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে অনলাইনে হয়েছে এবারের আয়োজনটি। ৫ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টায়

এই উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মতিয়ার রহমান হাওলাদার, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিঠু চৌধুরী। এবারের উৎসবে ১১২টি দেশ থেকে ৩,০৬১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। এরমধ্যে নির্বাচিত ১০৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এ উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব বিশেষজ্ঞ প্রেমেন্দ্র মজুমদার। জুরি বোর্ডে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা আশরাফ শিশির, ওয়াহিদ ইবনে রেজা, মোক্তাদির ইবনে ছালাম, অভিনেতা মনোজ কুমার প্রামাণিক, বাংলাদেশি চলচ্চিত্র সমালোচক সাদিয়া খালিদ রীতি ও ভারতীয় চলচ্চিত্র সমালোচক সিদ্ধার্থ মাইতি।

এ উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নেয় দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা, সমালোচক, লেখক, অভিনেতা ও অন্যান্য কলাকুশলীবৃন্দ। আলোচনা অনুষ্ঠানগুলোতে উৎসবের জুরি সদস্যদের পাশাপাশি অংশ নেন বাংলাদেশি নির্মাতা ও অভিনেতা তৌকির আহমেদ, নির্মাতা শামীম আখতার, নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী, ভারতীয় নির্মাতা অর্ণব মিদ্যা, বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি জয়দেব কুমার ভদ্র, ভারতীয় অভিনেত্রী অবন্তিকা বিশ্বাস, উর্মিলা মহন্ত, গায়িকা জুন চ্যাটার্জি, অভিনেতা সোহাম মজুমদারসহ বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, মিশর, ব্রাজিল, পাকিস্তান, বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা ও ভেনেজুয়েলা থেকে ৪০ জন চলচ্চিত্র নির্মাতা।

প্রতিবেদন: মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জবি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভার্চুয়াল প্রতিযোগিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে করোনাকালীন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ভিন্নধর্মী এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আবৃত্তি, গান, অভিনয়, বক্তৃতা, পোস্টার ও স্থিরচিত্র এই পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১৬ই জুলাই থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ৩টি বিভাগে অংশ নিতে পারবে। ৩০শে জুলাই প্রতিযোগিতা শেষে প্রতি বিভাগ থেকে সেরা তিনজন করে মোট ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া মুজিব শতবর্ষকে কেন্দ্র করে অংশগ্রহণকারী সেরা ১০০ জন শিক্ষার্থীকে সামাজিক সচেতনামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সনদপত্র দেওয়া হয়।

অনলাইনে শিল্পকলার 'পাহাড়ের বর্ণিল সংস্কৃতি'

'করোনার বিরুদ্ধে শিল্প' শিরোনামে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেইজে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেই ধারাবাহিক ৯ই জুলাই তিন পার্বত্য জেলার শিল্পীদের নিয়ে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় 'পাহাড়ের বর্ণিল সংস্কৃতি' শীর্ষক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিল্পীদের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখনে। এই আয়োজনে নেপালি ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করেন অতিথি শিল্পী তনুশ্রী মানজি চাকমা। জেকলিন তঞ্চঙ্গ্যা বান্দরবান থেকে গান পরিবেশন করেন। খাগড়াছড়ি থেকে রিয়া চাকমা নৃত্য ও তনুশ্রী চাকমা গান পরিবেশন করেন। রাঙামাটি থেকে নম্রতা খিসা গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও তিন জেলা থেকে অসংখ্য শিল্পী এ আয়োজনে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন রাঙামাটি জেলা কালচারাল অফিসার অনুসিনথিয়া চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন বিজ্ঞান্তর তালুকদার।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক পাচার রোধে বিজিবি'র ফ্লাইট পরিচালনা কার্যক্রম

সীমান্ত দিয়ে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধে বিজিবি দুটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে, যা লজিস্টিক সাপোর্টের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিগ্‌গিরই বিজিবি'র জন্য আরো দুটি হেলিকপ্টার ক্রয় করা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। ৮ই জুলাই জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকার মাদক নিয়ন্ত্রণ ও এর অনুপ্রবেশ বন্ধে যা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিবৃতি দেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সীমান্ত দিয়ে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিজিবি'র নিয়মিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়াও সম্প্রতি নতুন ৫টি বিওপি নির্মাণ করা হয়েছে। টেকনাফসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ৩১৭ কিলোমিটার বর্ডার রোড তৈরি করা হচ্ছে এবং স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তে স্মার্ট বর্ডার ম্যানেজমেন্টের আওতায় সীমান্তে সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

এছাড়া তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে সীমান্তপথে মাদক অনুপ্রবেশ বন্ধে ভিশন-২০৪১ এর আওতায় বিজিবি'র ১৬৮টি নতুন বিওপি নির্মাণ, বর্ডার সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এবং সীমান্ত সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেসব সীমান্তে নদীপথ রয়েছে, সেখানে বিশেষ করে টেকনাফ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বিজিবি'র জন্য ৪টি অত্যাধুনিক হাইস্পিড ইঞ্জিন বোট ক্রয় করা

হয়েছে। উপকূলীয়, চরাঞ্চল, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের বিওপিসমূহের জন্য ১৫২টি এটিভি (অল টেনিয়ন ভেহিকল) ক্রয় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো সরঞ্জামাদি কেনা হবে। এছাড়া স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্ট দিয়ে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ বন্ধে বিজিবি'র দুটি ভেহিকল এক্স-রে স্ক্যানার ও দুটি ব্যাগেজ স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সব স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্টে স্থাপন করা হবে।

মন্ত্রী আরো জানান, মাদকে অনুপ্রবেশ রোধে টেকনাফ, শাহপুরী, সেন্টমার্টিন, ইনানী, হিমছড়ি ও বাহারছড়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে দোবেকী ও কৈখালী এলাকায় হাইস্পিড বোটের সাহায্যে টহল দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কোস্টগার্ডের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনঃ জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমে টেলিগ্রাফ-এর প্রতিবেদনঃ

এক কোটি শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়বে

করোনা ভাইরাস মহামারির পরে প্রায় এক কোটি শিশু আর স্কুলে ফিরে যেতে পারবে না। শিক্ষা তহবিল কাটছাঁট ও দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার কারণে এই বিরাট সংখ্যক শিশু স্কুল থেকে ঝরে যাবে। যুক্তরাজ্যের দাতব্য প্রতিষ্ঠান সেভ দ্য চিলড্রেনের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমে টেলিগ্রাফ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেভ দ্য চিলড্রেনের ওই বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা প্রতিবেদনে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশে গত এপ্রিলের প্রথম থেকে স্কুল বন্ধ রয়েছে। এতে বিশ্বের প্রায় ১৬০ কোটি শিক্ষার্থী স্কুলের বাইরে।

শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া ঠেকাতে সরকারগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগাদা রয়েছে সেভ দ্য চিলড্রেনের ওই প্রতিবেদনে। যুক্তরাজ্য সরকার শুধু শরণার্থী শিশুদের শিক্ষা সুযোগ নিশ্চিত করতে আলাদাভাবে ৫৩ লাখ পাউন্ড সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইউএনএইচসিআরের বিশেষ দূত অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বলেছেন, লাখ লাখ শিশু ও তরুণ-তরুণীর জন্য স্কুল হচ্ছে সুযোগের সেরা মাধ্যম, আত্মরক্ষার ঢালও। সহিংসতা, নিপীড়ন ও অন্যান্য কঠিন পরিস্থিতি থেকে শিশুদের রক্ষা করে শ্রেণিকক্ষ। তাই শিশুরা যাতে শ্রেণিকক্ষে ফিরে যেতে পারে, সেই সুযোগ সরকারগুলোকেই সৃষ্টি করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৪ নম্বর লক্ষ্য হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক দেশ যে অগ্রগতি করেছিল, করোনা মহামারি সেটাকে ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে বলে সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এমনকি আগের অর্জনকেও এই মহামারি ম্লান করে দিতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর হার, তাদের পরিবারের আয়ের উৎস, শিক্ষার্থীর লিঙ্গ ও লেখাপড়ার অবস্থা খতিয়ে দেখেছে। মহামারির কারণে এসডিজি-ফোর লক্ষ্যমাত্রা (মানসম্পন্ন শিক্ষা) অর্জনের অগ্রগতি নিম্নমুখী হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ১০টি দেশকে চিহ্নিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। দেশগুলো হলো– আফ্রিকার দেশ নাইজার, মালি, লাইবেরিয়া, আফগানিস্তান, গিনি, মৌরিতানিয়া, ইয়েমেন, নাজেরিয়া, পাকিস্তান, সেনেগাল ও আইভরিকোস্ট।

প্রতিবেদনঃ নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীঃ বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ি এলাকায় দুস্থ মানুষের পাশে খাগড়াছড়ি সদর জোন

খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার বড়পাড়া এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (খাগড়াছড়ি সদর জোন)। ৮ই জুলাই বড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বিভিন্ন প্রসূতি ও গাইনি রোগীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেজর উম্মে হাবিবা, গাইনি বিশেষজ্ঞ, ৫ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স।

থানচিতে ৪০ জন বেকার নারীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণে সদর ইউনিয়ন পরিষদ

বান্দরবানের থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন পাড়ায় ৪০ জন বেকার যুবতী নারীকে সেলাই মেশিন দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭ই জুলাই সদর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এই সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। ঐ ৪০ জন নারীকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে থানচি সদর পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সেলাই কাজে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইএসপি-৩-এর প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাংসার খ্রো।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় গৃহবন্দি, কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ও বেলছড়ি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে ৫ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর উপহার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ সদস্য এবং মানিকছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ জব্বার। খাগড়াছড়ি ত্রাণ

সহায়তার ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ের বরাদ্দ থেকে গুমতি ইউপি'র ওয়ার্ড পর্যায়ে ছয়শ ২৮ পরিবার ও বেলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ছয়শ ২২ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১০ কেজি চাল ও ১ কেজি সয়াবিন তেল বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

গাজীপুর প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ

গাজীপুর সদরের ভাওয়াল মির্জাপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া নতুন কুঁড়ি পাবলিক স্কুল মাঠে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। ১৬ই জুলাই গাজীপুরে ডেইরি ফার্মাস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে ৩০ জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । এ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ডেইরী ফার্মাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আকরাম হোসেন বাদশা এবং সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর ইসলাম শাহিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাপাসিয়া ডেইরি ফার্মাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহমুদুল হাসান তুহিন, নয়া পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মোতয়াল্লী শফিকুর রহমান প্রমুখ ।

সরকার সব সময় প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে আছে

৩০ বছরে পা রাখল ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)। এ উপলক্ষে মিরপুরে বার্ডোর দপ্তর থেকে ২০শে জুলাই আয়োজন করা হয় ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানের। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি নিজেও সবসময় প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাবেন। তিনি আরো বলেন, আমি তাদের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব। সরকার সব সময় প্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে আছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

অনুশীলনে বাড়ছে ক্রিকেটারদের সংখ্যা

করোনাকালে সাহস করে বেরিয়ে পড়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশে সেরা ব্যাটসম্যানের এমন আগ্রহে অন্যরাও মাঠে ছুটে আসতে শুরু করেছেন। প্রথম দিন মিরপুর হোম অব ক্রিকেটে তিনজন দিয়ে অনুশীলন পর্ব শুরু হলেও পরের দিন ইমরুল এবং ২১শে জুলাই যোগ দিয়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ। যদিও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জুলাই ২০২০ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০-এর ভার্চুয়াল উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

এটা জাতীয় দলের কার্যক্রম না। এখন রাজাধানী ঢাকার মিরপুরে শেরে বাংলা, চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী, খুলনার শেখ নাসের ও সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামে যে ১০ ক্রিকেটার অনুশীলন করছেন, সেটা সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের ইচ্ছায়।

ক্রিকেট অপারেশন্স তথা বিসিবি শুধু তাদের স্টেডিয়ামে গিয়ে রানিং, জিম করা ও ব্যাটিং-বোলিং প্র্যাকটিসের সুযোগটা করে দিয়েছে। আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা মানে অবকাঠামোর জোগানও দেওয়া হয়েছে। ২১শে জুলাই তিন দিন চলল ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত অনুশীলন। তাদের সব রকম লজিস্টিক সার্পোট দেওয়ার পাশাপাশি পুরো প্র্যাকটিস শিডিউল বোর্ডেরই করা। ক্রিকেটাররা একজন অন্যজনের শারীরিক স্পর্শে না এসে যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে অনুশীলন করতে পারেন, তাদের কার কবে, কখন কি অনুশীলন-সবই বোর্ড থেকে রোস্টার করা হয়েছে।

এতে করে, উৎসাহী ক্রিকেটারের সংখ্যা আরো বাড়ছে। মুশফিকুর রহিম, ইমরুল কায়েস, শফিউল ইসলাম, মোহাম্মদ মিঠুন, নুরুল হাসান সোহান, মেহেদি হাসান মিরাজ, নাঈম হাসান, মেহেদি হাসান, খালেদ আহমেদ ও নাসুম আহমেদের সঙ্গে আরো দুজন ক্রিকেটার যোগ হতে যাচ্ছেন। দুজনই পেসার। এদের একজন তাসকিন আহমেদ, অন্যজন মেহেদি হাসান রানা।

ঈদের আগে এ ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনুশীলন চলবে আরো ৫ দিন অর্থাৎ ২৬শে জুলাই পর্যন্ত। তবে ঢাকার বাইরে থেকে নতুন কেউ অনুশীলনের জন্য আবদেন করেনি। ঢাকার বাইরে সিলেটে সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও নাসুম আহমেদ, খুলনায় মেহেদী হাসান ও নুরুল হাসান সোহান এবং চট্টগ্রামে নাঈম হাসান ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন শুরু করেছেন।

সাকিব শতাব্দীর দ্বিতীয় সেরা মূল্যবান খেলোয়াড়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হওয়া সাকিব আল হাসান দীর্ঘদিন আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে অলরাউন্ডারের শীর্ষস্থানটি দখল করে রেখেছিলেন। সম্প্রতি শতাব্দীর দ্বিতীয় সেরা মূল্যবান খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন কিংবদন্তি শিল্পী এন্ড্রু কিশোর

আফরোজা রুমা

দরাজ কণ্ঠে গেয়েছিলেন–'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, রইব না আর বেশি দিন তোদের মাঝারে'- এ গানটি শুনে আবেগতাড়িত হননি এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। গানের কথার মতোই চলে গেলেন কিংবদন্তি গায়ক এন্ড্রু কিশোর। ৬ই জুলাই দীর্ঘ ১০ মাস মরণব্যাধি ক্যান্সারে ভুগে রাজশাহীতে শিল্পীর বোনের নিজস্ব ক্লিনিকে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

এন্ড্রু কিশোরের জন্ম ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৫ সালে রাজশাহীতে। সেখানেই কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোর। পড়াশোনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট বিভাগে। তিনি প্রাথমিকভাবে সংগীতের পাঠ শুরু করেন রাজশাহীর আবদুল আজিজ বাচ্চুর কাছে। এক সময় গানের নেশায় রাজধানীতে ছুটে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, আধুনিক গান, লোকগান ও দেশাত্মবোধক গানে রেডিওর তালিকাভুক্ত শিল্পী হন। ১৯৭৭ সালে আলম খানের সুরে *মেইল ট্রেন* চলচ্চিত্রে 'অচিনপুরের রাজকুমারী নেই যে তার কেউ' গানের মধ্য দিয়ে এন্ড্রু কিশোরের চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক যাত্রা শুরু হয়। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর রেকর্ডকৃত দ্বিতীয় গান বাদল রহমান পরিচালিত *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী* চলচ্চিত্রের 'ধুম ধারাক্কা'। এন্ড্রু কিশোর বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বাধিক ১৫ হাজার গান গাওয়া শিল্পী। চলচ্চিত্রে তাঁর চেয়ে বেশি জনপ্রিয় গান আর কারো নেই। গায়কির অনন্য শৈলীতে এন্ড্রু কিশোর নিজেকে উন্নীত করেছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। 'জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প', 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস', 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে', 'আমার সারা দেহ খেওগো মাটি', 'আমার বুকের মধ্য খানে', 'ভেঙেছে পিঞ্জর মেলেছে ডানা', 'সবাই তো ভালোবাসা চায়', 'পড়ে না চোখের পলক', 'পদ্মপাতার পানি', 'ওগো বিদেশিনী', 'তুমি মোর জীবনের ভাবনা', 'আমি চিরকাল প্রেমেরই কাঙ্গাল', 'পৃথিবীর যত সুখ আমি তোমার ছোঁয়াতে খুঁজে পেয়েছি', 'আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান'সহ অসংখ্যা জনপ্রিয় বাংলা গান উপহার দিয়েছেন শ্রোতাদের। তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তাঁর শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে চিকিৎসার জন্য ১০ লাখ টাকা সহায়তা করেছিলেন। পাশাপাশি 'গো ফান্ড মি' নামে এক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সহশিল্পীদের মধ্যে অনেকে তাঁর পাশে দাঁড়ান। কিন্তু চিকিৎসায় তাঁর সুস্থতা আসেনি।

এন্ড্রু কিশোর তাঁর গায়কির অনন্য শৈলীতে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের বহু চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন, যেজন্য তিনি প্লেব্যাক সম্রাট নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের গানে অবদানের জন্য তিনি আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারগুলো হলো- ১৯৮২ সালে *বড় ভালো লোক ছিল* চলচ্চিত্রে হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, ১৯৮৬ সালে *সারেন্ডার* চলচ্চিত্রে সবাইতো ভালবাসা চায়, ১৯৮৯ সালে *ক্ষতিপূরণ* চলচ্চিত্রে আমি পথ চলি একা, ১৯৯০ সালে *পদ্মা মেঘনা যমুনা* চলচ্চিত্রে দুঃখ বিনা হয় না সাধনা, ১৯৯৬ সালে *কবুল* চলচ্চিত্রে এসো একবার দুজনে আবার তুমি আছ হৃদয়ের আঙ্গিনায়, ২০০০ সালে *আজ গায়ে হলুদ* চলচ্চিত্রে চোখ যে মনের কথা বলে, ২০০৭ সালে *সাজঘর* চলচ্চিত্রে, ২০০৮ সালে *কি যাদু করিলা* চলচ্চিত্রে কি যাদু করিলা গানে।

এছাড়া এন্ড্রু কিশোর একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি আহমাদ ইউসুফ, আনোয়ার হোসেন বুলু, ডলি জহুর, দিদারুল আলম বাদল, শামসুল ইসলাম নান্টুর সাথে টিভি নাটক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য প্রযোজনার জন্য 'প্রবাহ' নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

বরেণ্য সংগীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য ১৫ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। বরেণ্য এই শিল্পীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই গুণী শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 02, August 2020, Tk. 25.00

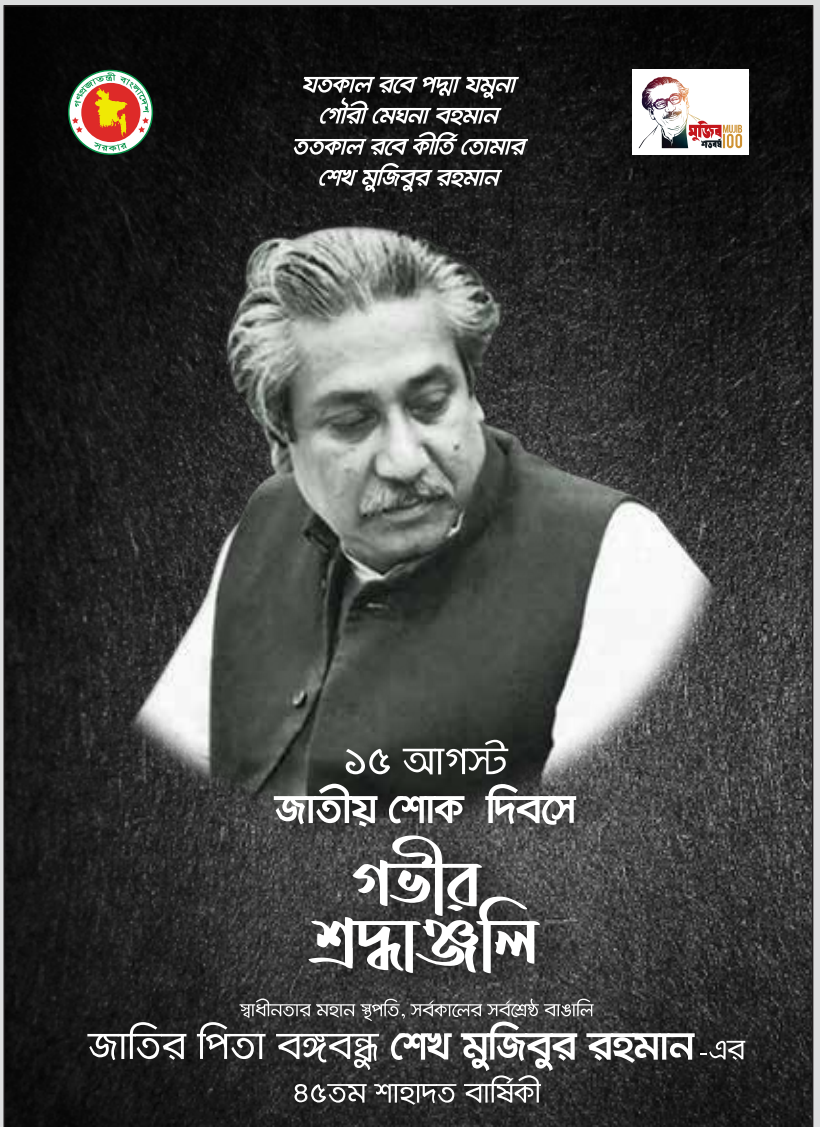

প্রকাশনায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, প্রচারে: গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ২০২০

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd